১২-১১-১৯২৫ অব্দের কলিকাতা গেজেটে বঙ্গের ডিরেক্টর বাহাদুর
কর্ত্তৃক স্কুল-পাঠ্য-পুস্তকরূপে অনুমোদিত।

বিবিধ সন্দর্ভ



মানব-প্রকৃতি, মহাপ্রস্থান, বিজ্ঞান পরিচয় প্রভৃতি গ্রন্থ
সেণ্ট কলম্বস্ কলেজের অধ্যাপক

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

—:০:—

পরিবর্দ্ধিত ৩য় সংস্করণ

১৯২৮

সোল এজেণ্ট :—
নাথ ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং
২৩নং, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

চুঁচুড়া, কালীকৃষ্ণ পাবলিশিং হাউস হইতে
শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রিণ্টার—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র নাথ,
শ্রীদুর্গা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১২৮।৪৫এ, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ভূমিকা

কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না। পাঠ্যপুস্তকের এত প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের এই পুস্তকখানি প্রকাশের প্রয়োজন কি,—ইহার একটা কৈফীয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

ভাষা শিক্ষার সহিত যাহাতে স্বদেশ ও স্বসমাজের আকাঙ্ক্ষিত আদর্শে চরিত্রগঠন ও কার্য্যশীলতার অনুশীলন করিয়া মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে পারা যায় সেই উদ্দেশ্য সাধনে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিবার জন্য এই পুস্তকখানি সঙ্কলিত হইল।

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু বিনয়ভূষণ সরকার মহাশয় একদিন কথাপ্রসঙ্গে এইরূপ একখানি গ্রন্থের সঙ্কলন কার্য্যে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমার অনুরোধ ও আগ্রহে শ্রীমান্ হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মহাশয়ের সাহায্যে এই গ্রন্থখানি সঙ্কলন ও সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। বিনয়বাবুর নিকট তাঁহার সাহায্যের জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ এবং যে সকল প্রথিতযশঃ লেখকের রচনা হইতে প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে তাঁহাদের নিকটও অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

পুস্তকখানি হইতে ছাত্রগণের কিছুমাত্র উপকার হইলেও সমস্ত শ্রম সার্থক বোধ করিব। ইতি—

চুঁচুড়া।
৩০শে মার্চ্চ, ১৯২৫। } প্রকাশক।

৩য় সংস্করণের ভূমিকা

খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে আমাদের ছাত্রগণের বিশেষতঃ পল্লীগ্রামস্থ ছাত্রগণের ধারণা অতি ভ্রান্ত। অথচ এই খাদ্যাখাদ্য বিচারের সহিত াাদের ব্যক্তিগত এবং জাতিগত জীবন-মরণ সমস্যা ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। সেইজন্য অতি প্রয়োজনীয় বোধে এই সংস্করণে বাঙ্গালীর খাদ্য শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দেওয়া হইল। আর বাঙ্গলার দুইজন বিশ্ব-বিখ্যাত কর্ম্মবীরের সংক্ষিপ্ত জীবনীও এই সংস্করণে দেওয়া গেল।

পুস্তকখানি ছাত্রগণের অধিকতর চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য কয়েকখানি চিত্রও সংযোজিত হইয়াছে।

প্রত্যেক প্রবন্ধের সূচনায় প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য ও বর্ণনীয় বিষয়ের বিশ্লেষণ এবং প্রবন্ধ শেষে প্রশ্নাবলী সংযোগ করা হইয়াছে।

আশা করি, এই সংস্করণে পুস্তকখানি শিক্ষক মহাশয়গণের অধিকতর সহানুভূতি ও কৃপাদৃষ্টি লাভে সমর্থ হইবে। ইতি—

চুঁচুড়া।
৩০শে নভেম্বর, ১৯২৮।

বিনীত—
প্রকাশক।

সূচীপত্র

বিবিধ সন্দর্ভ

ও

কবিতাপাঠ

-ঃ*ঃ-

একলব্য

বিশ্লেষণ ঃ—

প্রবন্ধের বর্ণনীয় ও প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ—১। একলব্যের অতুলনীয় গুরুভক্তি ও আত্মত্যাগকাহিনী। ২। একলব্যের উন্নতিমূলে আমরা শিক্ষা পাই যে উদ্যম, অধ্যবসায়, স্বাবলম্বন, সহিষ্ণুতা ও একাগ্রতা এই পাঁচ শক্তিই মানবের সকল উন্নতির মূল। ৩। মানব নিজে যথার্থ গুণী হইলে ব্যক্তিবিশেষের কাছে পুরস্কৃত না হইলেও জগতের কাছে অপুরস্কৃত থাকেন না।

একলব্য নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র। নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও একলব্যের একাগ্রতা, উৎসাহ ও অধ্যবসায় জগতে অতুলনীয়। নিষাদ-বালক বাল্যকাল হইতে শরনিক্ষেপ ও অস্ত্রচালনা-পূর্ব্বক মৃগয়া শিক্ষা করিত কিন্তু তাহাতে তাহার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইত না। একদিন একলব্য দেখিতে পাইল কুরুবংশীয়

এবং যদু বৃষ্ণি ভোজ প্রভৃতি সম্ভ্রান্তবংশীয় বালকগণ অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ, মহাপ্রাজ্ঞ, সুশিক্ষক দ্রোণাচার্য্যের নিকটে অস্ত্রবিদ্যা ধনুর্ব্বেদাদি শিক্ষা করিতেছে। দেখিয়া বালক একলব্যের অন্তঃকরণ আনন্দে পূর্ণ হইল, আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হইল। বালক অতি বিনীতভাবে সশঙ্কচিত্তে দ্রোণাচার্য্যের সাক্ষাৎকার লাভের সুবিধা খুঁজিতে লাগিল।

একদিন সে সুবিধা হইল। একদিন মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যকে নির্জ্জনে পাইয়া একলব্য প্রণামপূর্ব্বক করযোড়ে দাঁড়াইল। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস, কি চাও ?"

অভীষ্ট দেবতা প্রত্যক্ষ হইয়া বর দিতে চাহিলে মানব যেমন অবশ, বিহ্বল হইয়া পড়ে আচার্য্যের মধুর বাক্যে বালকও তেমনি হইয়া গেল। তারপর অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় করিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "আমি আপনার দাস হইয়া আপনার চরণাশ্রয়ে থাকিয়া ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে চাই।" এইটুকু বলিতেই তাহার হৃৎকম্প হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। প্রফুল্লমুখে দ্রোণাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?" তখন সত্যবাক্ একলব্য উত্তর করিল,—"আমি নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র, আপনার দাস একলব্য।"

তখন সেই অমিততেজা ব্রাহ্মণ, সম্ভ্রান্তবংশীয় বালকদিগের শিক্ষাগুরু, অর্জ্জুনাদি কৃতী ও কীর্ত্তিমান শিষ্যগণের আচার্য্য সেই শিক্ষার্থী দীনবেশী প্রতিভাশালী বালককে "নিষাদপুত্র" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। জাত্যভিমান, পদগৌরব সময়ে সময়ে মানবকে হৃদয়হীন করিয়া থাকে।

একলব্য বালক হইলেও বীর। সে সাশ্রুলোচনে ভক্তিভাবে দ্রোণাচার্য্যের চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

বিদায় হইয়া একলব্য গৃহে গেল না। নির্জ্জন বনে, দ্রোণাচার্য্যের মৃণ্ময় মূর্ত্তি গঠন করিয়া তাহা সম্মুখে রাখিয়া নিষাদবালক অভিপ্রেত লাভের নিমিত্ত সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। কঠোর সাধনা-বলে অন্যের উপদেশ-নিরপেক্ষ হইয়াও একলব্য ধনুর্ব্বিদ্যায় অদ্বিতীয় পারদর্শী হইয়া উঠিল।

একদা কুরুকুমারগণ মৃগয়ার্থে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের পালিত কুক্কুরসকল বিকট চীৎকারে মৃগয়ার সহায়তা করিতে লাগিল। যেখানে মনস্বী বালক একলব্য ধনুর্ব্বাণ লইয়া সাধনা করিতেছিল, কৌরবদিগের পালিত একটি কুক্কুর সেইখানে গিয়া বিকট রব করিতে প্রবৃত্ত হইল।

কুক্কুরের চীৎকারে একলব্যের মনে বিরক্তি জন্মিল। তাহার ধ্যানে—তাহার একাগ্রতায় বিঘ্ন হইতেছে দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে কুক্কুরের মুখে শর বিদ্ধ করিল। কুক্কুর চীৎকার করিতে অসমর্থ হইয়া ব্যথিতভাবে প্রভুদিগের নিকট উপস্থিত হইল।

কুক্কুরের অবস্থা দেখিয়া কুরুকুমারগণ বিস্মিত হইলেন। তাহার শরীরে রক্তপাত হয় নাই, মুখে আঘাতের চিহ্ন নাই, অথচ শর-বিদ্ধ হইয়া তাহার চীৎকার-শক্তি রহিত; কে এমন অস্ত্রবিদ্যা সম্পন্ন, কে এমন অপূর্ব্ব ক্ষমতাপন্ন যেন মন্ত্রবলে এই সারমেয়কে মূক করিয়াছে।

এই শর-নিক্ষেপকারীকে নিজেদের হইতে নিপুণতর জানিয়া কুমারগণ একান্ত চমৎকৃত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া একলব্যকে দেখিতে পাইলেন। বালকের মস্তকে জটা, গলদেশে

রুদ্রাক্ষমালা, পরিধানে গৈরিক বাস। সেই তাপসবেশী বালক পর্ণকুটিরে এক মৃন্ময় মূর্ত্তির সমীপে মৃগচর্ম্মে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে অস্ত্রচালনা-কৌশল অভ্যাস করিতেছিল। কুমারগণ নিকটস্থ হইলে একলব্য স্বাগত সম্ভাষণ করিল।

তখন কুমারেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুকুরের মুখে কি আপনি শর বিদ্ধ করিয়াছেন ?"

একলব্য উত্তর করিল, "কুকুরটি আমাকে বড়ই বিরক্ত করিতেছিল, সেইজন্য আমিই এ কাজ করিয়াছি।"

তখন রাজকুমারগণ পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া বলিলেন, "আপনি কে ? আপনি কোন্ গুরুর নিকটে ধনুর্বিবদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন ?"

নিজ জ্ঞান ও বিশ্বাসানুসারে বালক-তাপস বলিল, "আমি নিষাদ-রাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য। আমি ভগবান্ দ্রোণাচার্য্যের প্রসাদাৎ অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেছি।

নিষাদ-পুত্রের কথা শুনিয়া ক্ষত্রিয় কুমারগণ স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহাদের বীরগর্ব্বে—তাঁহাদের শিক্ষা ও শৌর্য্যে বড়ই আঘাত লাগিল। বিশেষতঃ দ্রোণাচার্য্যের প্রিয়তম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য অর্জ্জুন লজ্জায় ও অভিমানে মৃততুল্য হইলেন। আর কোনও কথা না বলিয়া সকলে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা হস্তিনাপুরে আসিলে, অভিমানী অর্জ্জুন নির্জ্জনে দ্রোণাচার্য্যকে বলিতে লাগিলেন,—"গুরুদেব, আপনি বলিয়াছেন,— "তোমার তুল্য, আমার শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম শিষ্য আর কেহ নাই এখন সে কথার অন্যথা দেখিয়া আমার মরণাধিক যন্ত্রণা হইতেছে।"

বিস্মিত হইয়া আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি অর্জ্জুন ?" অর্জ্জুন আকুল হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"বনের ভিতরে তাপসবেশী নিষাদ-পুত্র একলব্য আপনারই শিষ্য ; তাহার শর-নিক্ষেপ-কৌশল দেখিয়া আমরা সকলে অবাক্ হইয়াছি ; তাহাকে আপনি যেরূপ কৌশল শিখাইয়াছেন, আমরা কেহই তাহা জানি না।"

অধিকতর বিস্মিত চিত্তে দ্রোণাচার্য্য বলিলেন,—"একলব্য আমার শিষ্য ?—আমি যে তাহাকে অস্ত্রবিদ্যা শিখাইয়াছি, একথা তোমাকে কে বলিল ?"

"সে নিজেই বলিয়াছে।" এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন।

শুনিয়া নিষাদ-পুত্রের প্রতি দ্রোণাচার্য্য যার-পর-নাই কুপিত হইলেন। তিনি মনে করিলেন কোনও অহঙ্কৃত ক্ষমতান্ধ নিষাদ-পুত্র কুরু-কুমারদিগের শিক্ষা-গৌরব পরাজয় করিবার জন্য মিথ্যা প্রতারণা করিয়াছে। অতএব তাহাকে সমুচিত প্রতিফল ও বালকগণকে সান্ত্বনা দান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কথা ভাবিয়া কুমার-গণকে সঙ্গে লইয়া তিনি একলব্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। হায়! তখন আচার্য্য জানিতেন না যে, একলব্য তন্ময় হইয়া তাঁহাকেই গুরু কল্পনা করিয়া নিজ পুরুষকার প্রভাবে অনির্ব্বচনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাহা জানিলে তিনি সেরূপ মনস্বী বালককে বিপন্ন করিতে কৌশল-জাল বিস্তার করিতে পারিতেন না।

সহসা অভীষ্ট গুরু দ্রোণাচার্য্যকে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া আনন্দে একলব্যের হৃদয় পূর্ণ হইল। একলব্য ভক্তি-উচ্ছসিত হৃদয়ে আচার্য্যের পদতলে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল। দেখিয়া

দ্রোণাচার্য্যের মনে পড়িল এই বালক একদিন তাঁহার নিকটে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। তিনি সেই কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "শুনিলাম তুমি অস্ত্র-বিদ্যায় সুনিপণ হইয়াছ; তুমি কাহার শিষ্য, একলব্য ?'

একলব্য করযোড়ে উত্তর করিল,—"গুরুদেব, এ দাস আপনারই শিষ্য।"

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন, "তাহাই যদি হয়, তবে তুমি আমাকে গুরু-দক্ষিণা প্রদান কর।"

তখন ভক্তিমান্ সেই বালক আনন্দ ও বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া বলিল, "প্রভো আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই; আপনি আজ্ঞা করুন, আমি আপনাকে অভিপ্রেত বস্তু দক্ষিণা দিয়া কৃতার্থ হইব।"

তথাপি দ্রোণাচার্য্য তাহার পবিত্র হৃদয় চিনিতে পারিলেন না। আচার্য্য অবাধে আদেশ করিলেন, "তোমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া আমাকে দাও, আমি তাহাই দক্ষিণারূপে গ্রহণ করিব।"

সে আচার্য্যের এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া ভীত হইল না, চমকিত হইল না। এ কার্য্যে তাহার বহুবর্ষব্যাপী সাধনা ব্যর্থ হইবে, তাহা ভাবিয়া কাতর হইল না। সেই সত্যব্রত বীর অবলীলা-ক্রমে নিজ অঙ্গুষ্ঠ কর্ত্তন করিয়া দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে রাখিয়া দিল। শান্তি ও পরিতৃপ্তিতে তাহার চন্দ্রানন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এই মহানুভবতা দেখিয়া, এবং নিষাদ-পুত্রের সমস্ত কাহিনী শুনিয়া সশিষ্য দ্রোণাচার্য্য যেমন চমৎকৃত হইলেন, তেমনি অনুতপ্ত হইলেন। একলব্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া শিষ্য-মণ্ডলী লইয়া গুরুদেব প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু গুরুর উপরে এক বিশ্ব-গুরু আছেন, যিনি মানবের হৃদয দেখিয়া বিচার কবেন। সেই বিশ্ববিধাতা, মহাসাধক একলব্যকে সম্পূর্ণ পুরস্কৃত কবিলেন,—একলব্যকে অমর জীবন প্রদান করিলেন। এই জগৎ যতদিন বিদ্যমান রহিবে, বীর-সাধক বালকরত্নের সাধনা, উন্নতিলাভ এবং গুরুভক্তিজনিত আত্মত্যাগকাহিনী ও তৎসহ তদীয যশোলক্ষ্মী ততদিন বিরাজিত রহিবে। ইহাই ভগবৎপ্রদত্ত পুরস্কার।

আমবা একলব্যেব উন্নতিমূলে যে শিক্ষা পাই, তাহা সমস্ত মানবের উন্নতি সাধনাব শিক্ষা। সে শিক্ষা এই যে উদ্যম, অধ্যবসায়, স্বাবলম্বন, সহিষ্ণুতা ও একাগ্রতা এই পাঁচটী শক্তিই মানবের সকল উন্নতির মূল। যিনি এই পাঁচটী শক্তির যথোচিত অনুশীলন করিতে পারিবেন তিনি একলব্য বা বিশ্বামিত্র না হউন, বিদ্যাসাগর মহাশয় বা দাদাভাই নৌরজী না হউন, তিনি আত্মোন্নতি নিশ্চিত লাভ করিবেন। তাঁহার মানব জীবন ব্যর্থ হইবে না।

প্রশ্ন।

১। নিম্নলিখিত দুরূহ শব্দগুলিব অর্থ ও সমাস বাক্য বল।

শরনিক্ষেপ, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ, সশঙ্কচিত্তে, উপদেশ-নিবপেক্ষ, মনস্বী, কৌতূহলাক্রান্ত, আনুপূর্ব্বিক, ভক্তি-উচ্ছ্বসিত, বহুবর্ষব্যাপী, অবলীলাক্রমে, আত্মত্যাগকাহিনী, স্বাবলম্বন।

২। এই গল্প পড়িয়া কি শিখিলে?

৩। স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায় উন্নতির মূল এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ রচনা কর।

আরবজাতির অতিথি-পরায়ণতা

বিশ্লেষণ ঃ—

বর্ণনীয় বিষয় ঃ—১। আরবজাতির অদ্ভুত অতিথি পরায়ণতার একটী গল্প। ২। আরবদিগের জাতীয় ধর্ম্ম—প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইলেও অতিথির অনিষ্ট চিন্তা করা নিষিদ্ধ।

বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীতে কোন জাতিই আতিথেয়তা বিষয়ে আরবদিগের তুল্য নহে। কেহ অতিথিভাবে আরবদিগের আলয়ে উপস্থিত হইলে, তাহারা সাধ্যানুসারে তাহার পরিচর্য্যা করে। সে ব্যক্তি শত্রু হইলেও, অণুমাত্র অনাদর, বিদ্বেষ প্রদর্শন বা বিপক্ষতাচরণ করে না।

কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে যখন আরবজাতির সহিত মূরদিগের সংগ্রাম হইতেছিল, একদা একদল আরব সেনা, বহুদূর পর্য্যন্ত এক মূরসেনাপতির অনুসরণ করে। সেনাপতি অশ্বারোহণে ছিলেন, এবং প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। আরবেরা তাঁহার অনুসরণে বিরত হইলে, তিনি স্বপক্ষীয় শিবিরের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দিগ্‌ভ্রম হইয়াছিল, এজন্য দিঙ্‌নির্ণয় করিতে না পারিয়া, তিনি বিপক্ষের শিবিরসন্নিবেশ স্থানে উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে তিনি এরূপ ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে, আর কোনক্রমে অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতে পারিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি এক আরব-সেনাপতির পটমণ্ডপদ্বারে

উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। আরব-সেনাপতি তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত আশ্রয় প্রদান করিলেন, এবং তাঁহাকে নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত অভিভূত দেখিয়া আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিলেন।

মূরসেনাপতি ক্ষুন্নিবৃত্তি, পিপাসা-শান্তি ও ক্লান্তি-পরিহার করিয়া উপবিষ্ট হইলে, বন্ধুভাবে উভয় সেনাপতির কথোপকথন হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পর স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের সাহস, পরাক্রম, সংগ্রাম-কৌশল প্রভৃতির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সহসা আরব-সেনাপতির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান ও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং কিঞ্চিৎ পরেই বলিয়া পাঠাইলেন, "আমার অতিশয় অসুখবোধ হইয়াছে, এজন্য আমি উপস্থিত থাকিয়া আপনার পরিচর্য্যা করিতে পারিলাম না। আহার-সামগ্রী ও শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি আহার করিয়া শয়ন করুন। আর আমি দেখিলাম, আপনার অশ্ব যেরূপ ক্লান্ত ও হতবীর্য্য হইয়াছে তাহাতে আপনি কোনওক্রমে নিরুদ্বেগে ও নিরুপদ্রবে স্বীয় শিবিরে পঁহুছিতে পারিবেন না। অতি প্রত্যূষে এক দ্রুতগামী তেজস্বী অশ্ব সজ্জিত হইয়া পটমণ্ডপের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিবে। আমিও সেই সময় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং যাহাতে আপনি সত্বর প্রস্থান করিতে পারেন তদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত আনুকূল্য করিব।

কি কারণে আরব সেনাপতি এরূপ বলিয়া পাঠাইলেন তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া মূরসেনাপতি আহার করিয়া সন্দিহান চিত্তে শয়ন করিলেন। রজনীশেষে আরব সেনাপতির লোক

তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিল এবং বলিল, "আপনার প্রস্থানের সময় উপস্থিত, গাত্রোত্থান ও মুখ প্রক্ষালন করুন, আহারও প্রস্তুত।" মূরসেনাপতি শয্যাপরিত্যাগপূর্ব্বক মুখ প্রক্ষালন সমাপন করিয়া আহার স্থানে উপস্থিত হইলেন কিন্তু সেখানেও আরব-সেনাপতিকে দেখিতে পাইলেন না ; পরে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি সজ্জিত অশ্বের মুখরশ্মি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।

মূরসেনাপতিকে 'আরবসেনাপতি দর্শনমাত্র সাদর সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন এবং বলিলেন, "আপনি সত্বর প্রস্থান করুন ; এই বিপক্ষ শিবিরের মধ্যে আমার অপেক্ষা আপনার ঘোরতর শত্রু আর কেহ নাই। গত রজনীতে যৎকালে আমরা উভয়ে একাসনে আসীন হইয়া অশেষবিধ কথোপকথন করিতেছিলাম, আপনি স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে আমার পিতার প্রাণহন্তার নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। আমি শ্রবণমাত্র বৈর-সাধন বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া বারংবার এই শপথ ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, "সূর্য্যোদয় হইলেই প্রাণপণে পিতৃহন্তার প্রাণবধ সাধনে প্রবৃত্ত হইব। এখন পর্য্যন্ত সূর্য্যের উদয় হয় নাই, আপনি সত্বর প্রস্থান করুন। আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম এই,—প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইলেও অতিথির অনিষ্ট চিন্তা করি না। কিন্তু আমার পটমণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেই আপনার অতিথিভাব অপগত হইবে ; এবং সেই মুহূর্ত্ত অবধি আপনি স্থির জানিবেন, আমি আপনার প্রাণসংহারের নিমিত্ত প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিব। এই যে অপর অশ্ব সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে দেখিতেছেন, সূর্য্যোদয় হইবামাত্র আমি উহাতে আরোহণ করিয়া বিপক্ষভাবে আপনার

অনুসরণ করিব। কিন্তু আমি আপনাকে যে অশ্ব দিয়াছি উহা কোনক্রমে আমার অশ্ব অপেক্ষা হীন নহে। যদি উহা দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে তাহা হইলে আমাদের উভয়ের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।

এই বলিয়া আরবসেনাপতি সাদর সম্ভাষণ ও করমর্দ্দনপূর্ব্বক মূর-সেনাপতিকে বিদায় দিলেন; তিনিও তৎক্ষণাৎ বেগে প্রস্থান করিলেন। আরব সেনাপতিও সূর্য্যোদয় দর্শনমাত্র অশ্বে আরোহণ করিয়া তদীয় অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু মূরসেনাপতিকে স্বপক্ষ শিবিরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া অতঃপর আর বৈরসাধনসঙ্কল্প সফল হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া স্বীয় শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রশ্ন।

১। নিম্নলিখিত দুরূহ শব্দগুলির অর্থ বল ও সমাসযুক্ত বাক্যগুলির সমাস ও সমাসবাক্য বল।

আতিথেয়তা, পরিচর্য্যা, দিগ্‌ভ্রম, পটমণ্ডপদ্বারে, ক্ষুন্নিবৃত্তি, হতবীর্য্য, আনুকূল্য, বৈরসাধনসঙ্কল্প।

২। হিন্দুর অতিথি-পরায়ণতা ও আশ্রিত বাৎসল্যেও ঐরূপ কোন উদাহরণ দিতে পার কি?

স্বগ্রামবাসী

বিশ্লেষণ ঃ—

বর্ণনীয় বিষয় ঃ—ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চ বা নীচ নির্ব্বিশেষে নিজ নিজ গ্রামের উন্নতি সাধনার্থ কিরূপে কার্য্য করিতে পারা যায় এবং করা উচিত তাহার বর্ণনা।

আমাদের শাস্ত্রে বলে যে, জননী এবং জন্মভূমি স্বর্গের অপেক্ষাও গৌরবের বস্তু।) অতএব যে গ্রামে যাঁহার জন্ম তাঁহার পক্ষে সে গ্রাম বড়ই আদর ও গৌরবের বস্তু হওয়া উচিত। সকলেরই আপন আপন গ্রামের মঙ্গল সাধনে প্রাণপণ যত্ন করা কর্ত্তব্য। গ্রামের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা গ্রামের অপর সকল লোককে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিবেন। তজ্জন্য তাঁহাদের গ্রামে স্কুল পাঠশালার স্থাপন ও রক্ষা করা আবশ্যক। গ্রামের মধ্যে যাঁহারা ধনবান্ বা সঙ্গতিশালী তাঁহাদের উচিত যে, গ্রামের লোকের যে সকল অভাব থাকে তাহা মোচন করেন এবং গ্রামের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যে সকল অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন তাহা সম্পন্ন করেন। গ্রামে বিদ্যালয়ের অভাব হইলে অর্থ দিয়া তাঁহাদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থের বা ধনবান্ ব্যক্তির বাটীতে পাঠশালা থাকিত। তথায় গ্রামের সমস্ত ছেলে অবস্থাভেদে বিনা বেতনে বা অতি অল্প বেতনে লেখাপড়া করিত; এইরূপ পাঠশালা স্থাপন করা তাঁহারা অবশ্য কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহাদের এই

সৎকার্য্য যথার্থই অনুকরণীয়। পূর্ব্বে ধনবান্ ও সম্পন্ন ব্যক্তিরা গ্রামের লোকের জলকষ্ট মোচন করিবার নিমিত্ত পুষ্করিণী খনন করা পরম কর্ত্তব্য ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মানুষ্ঠান মনে করিতেন। এখন এদেশে অনেক গ্রামে অতিশয় জলকষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বের পুষ্করিণী সকল মজিয়া যাওয়ায় এবং মধ্যে মধ্যে পরিস্কৃত না হওয়ায় এই জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। দূষিত জল পান করিবার দরুণ সকল গ্রামেই এখন পূর্ব্বাপেক্ষা পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই জলকষ্ট নিবারণ করা গ্রামের সঙ্গতিশালী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। স্বগ্রামবাসীদিগের নিমিত্ত উত্তম পানীয় জলের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে রোগশোক হইতে মুক্ত করা অপেক্ষা সম্পন্নজনের সম্পত্তির ও ধনবানের ধনের আর নীতিধর্ম্ম-অনুমোদিত উৎকৃষ্টতর ব্যবহার হইতে পারে না। ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়া গ্রামবাসীদিগের এই উপকারটুকু না করা মহাপাপ। এমন অনেক ধনীলোক আছেন যাঁহারা বৃথা আমোদ-আহ্লাদে বা অনাবশ্যক দানে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু স্বগ্রামবাসীদিগের বিষম জলকষ্ট নিবারণার্থ একটী কপর্দ্দকও ব্যয় করা কর্ত্তব্য মনে করেন না। তোমরা তাঁহাদিগের ন্যায় হইও না। যদি ধনোপার্জ্জন করিতে পার তবে গ্রামের জলকষ্ট মোচন-করণার্থ পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করাইয়া দিও।

জলকষ্ট নিবারণার্থ গ্রামের শিক্ষিত লোক আর একটী সহজ উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। বিবাহাদি উপলক্ষে অনেক গ্রামে বারোয়ারী পূজা প্রভৃতির চাঁদাস্বরূপ অনেক টাকা উঠে। কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ না করিয়া সকলকে সদ্‌বুদ্ধি দিয়া সম্মত করিয়া সেই টাকা দ্বারা গ্রামের লোকের ব্যবহারার্থ ভাল পুষ্করিণী

খনন করা এবং সময়ে সময়ে তাহার পঙ্কোদ্ধার প্রভৃতি পরিষ্করণ কার্য্য সম্পন্ন করা তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

এখন কোন গ্রামে মারিভয় বা পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইলে তথাকার লোক প্রায়ই গবর্ণমেণ্টের নিকট ঔষধ ও চিকিৎসক প্রার্থনা করিয়া থাকে কিন্তু এই প্রকারের সমস্ত প্রার্থনা অনুসারে কার্য্য করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অসম্ভব। গ্রামে মারিভয় বা পীড়াধিক্য উপস্থিত হইলে গ্রামের বা নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের ধনবান বা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিদিগের নিজব্যয়ে ঔষধ ও চিকিৎসকের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত। গ্রামে সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির অভাব হইলে সমস্ত গ্রামবাসী-দিগের একত্র হইয়া বিবাহাদি উপলক্ষে প্রাপ্ত টাকা দ্বারা অথবা চাঁদা করিয়া কিছু টাকা তুলিয়া তদ্দ্বারা ঔষধাদি সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

গ্রামের শিক্ষিত ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরা আরও নানাপ্রকারে গ্রামবাসীদিগের উপকার বা মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। অনেক গ্রামে এক পাড়া হইতে অন্য পাড়ায় যাইবার ভাল পথ থাকে না এবং থাকিলেও সংস্কারাভাবে তাহা অব্যবহার্য্য হইয়া থাকে। তাঁহারা ভাল পথ করিয়া দিয়া বা পথ মেরামত করাইয়া দিয়া গ্রামবাসীদিগের বিশেষ উপকার সাধন করিতে পারেন। গ্রাম্য পথ প্রস্তুত বা সংস্কার করিতে অধিক ব্যয় হয় না। অনেকস্থলে দুই চারি টাকা ব্যয় করিয়া কয়েক ঝোড়া মাটি ফেলাইয়া দিলেই পথ ঠিক হইয়া যায়। বর্ষাকালে গ্রামের মধ্যে স্থানে স্থানে জল জমিয়া গ্রামবাসীদিগের গমনাগমনের অসুবিধা উৎপাদন করে এবং স্বাস্থ্যের হানি করে। টাকাটা সিকাটা খরচ করিয়া নালা কাটাইয়া জল সরাইয়া বাহির করিয়া দিলেও গ্রামবাসীদিগের বিশেষ উপকার হয়।

গ্রামবাসীদিগের মধ্যে বিষয় সম্পত্তি লইয়া বা অপর কারণে বিবাদ উপস্থিত হইলে যাঁহারা শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ ও সম্ভ্রান্ত তাঁহাদের তাহা মিটাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল বিবাদ নানা অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে। এই সকল বিবাদ আদালতে গেলে বিবাদিগণের বিস্তর অর্থ নষ্ট হয়, তাহাদের চিরশত্রুতা দাঁড়াইয়া যায়, গ্রামের লোকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে শেখে ও মোকর্দ্দমাপ্রিয় বা মামলাবাজ হয়। এই সকল বিবাদ হইতে দলাদলি উপস্থিত হইয়া গ্রামবাসিগণের মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, নির্য্যাতন-স্পৃহা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়া গ্রাম ছারখার হইয়া যায়। গ্রামকে এই সকল বিষম অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং গ্রামবাসিগণের মধ্যে প্রীতি, সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধনার্থ শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রেরই প্রাণপণে এই সকল বিবাদ নিবারণ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে গ্রামের মধ্যে সকল জাতি ও অবস্থার লোকের মধ্যে অপূর্ব্ব প্রীতি ও সদ্ভাব দেখা যাইত। গ্রামের হিন্দু মুসলমানের মধ্যেও বিশেষ সোহার্দ্দ্য ছিল। যাঁহারা ধনে বা জাত্যংশে প্রধান তাঁহারাও কৃষক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, বাগ্দী, দুলে প্রভৃতি দরিদ্র বা নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকেও যথেষ্ট আদর যত্ন করিতেন; তাহাদিগকে লইয়া নানা বিষয়ে মন খুলিয়া ও জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া মিষ্টালাপ করিতেন। গ্রামের প্রধান ব্যক্তিরা কোন কৃষককে দাদা বলিতেন, কোন কর্ম্মকারকে খুড়া বলিতেন, কোন বাগ্দীকে ভাইপো বলিতেন। ইহাতে সমস্ত গ্রামবাসী যেন একই পরিবাররূপে প্রতীয়মান হইত। অনেক গৃহকর্ত্রী এবং গৃহিণী গ্রামের যে সকল

দরিদ্রের আহার জুটিত না তাহাদিগকে অন্নদান না করিয়া আপনারা ভোজন করিতেন না। কাঙ্গালিনী ভোজনপাত্র হস্তে লইয়া মধ্যাহ্নকালে গৃহস্থের রন্ধনশালার সম্মুখে দাঁড়াইলে অন্ন-ব্যঞ্জন পাইত। নিম্নশ্রেণীর লোক উচ্চশ্রেণীর সঙ্গগুণে এবং তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান্ বলিয়া সুরাপান প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম বড় বেশী করিত না এবং বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে আদালতে না গিয়া উচ্চশ্রেণীর দ্বারা তাহা মিটাইয়া লইত। ইহাতে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে নীতি-ধর্ম্মের উন্নতি হইত। দুঃখের বিষয় এখন গ্রামবাসীদের মধ্যে আর সে সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ্য নাই। নিম্নশ্রেণী উচ্চশ্রেণীকে আর তেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা করে না। সেইজন্য এখন গ্রামবাসীদিগের মধ্যে দলাদলি বৃদ্ধি হইয়াছে, গ্রামবাসীরা পরস্পরকে হিংসা দ্বেষ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শিক্ষিত লোকের পক্ষে ইহা বড় লজ্জার কথা। সকল শিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষেই যেন পূর্ব্বের ন্যায় জাত্যভিমান, ধনগর্ব্ব প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কি ছোট, কি বড়, কি উচ্চবংশীয়, কি নিম্নবংশীয়, সকল গ্রামবাসী ও গ্রামবাসিনীকে পাত্রপাত্রী-ভেদে ভক্তি শ্রদ্ধা ও আদর যত্ন করেন এবং সাধ্যানুসারে তাহাদের মঙ্গল সাধন করিবার চেষ্টা করেন।

প্রশ্ন।

১। এই প্রবন্ধ পড়িয়া কি শিখিলে ?

২। তুমি তোমার গ্রামের উন্নতির জন্য কি ভাবে চেষ্টা এবং কার্য্য কর।

৩। নিম্নলিখিত দুরূহ শব্দগুলির অর্থ বল।

সুখস্বাচ্ছন্দ্য, সঙ্গতিশালী, নীতিধর্ম্ম-অনুমোদিত, মারিভয়, অব্যবহার্য্য, পরশ্রীকাতরতা, নির্য্যাতনস্পৃহা, দুষ্প্রবৃত্তির, সৌহার্দ্দ্য।

যুধিষ্ঠিরের তপোবন-গমন

প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয়ঃ—১। জতুগৃহ হইতে পলায়নের পর সমাতৃক পঞ্চ পাণ্ডবের তপোবন গমন বৃত্তান্ত। ২। তপোবনের শোভা বর্ণন। ৩। তপোবনে ব্যাসদেবের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ লাভ।

পাণ্ডবগণের বিনাশার্থ কুচক্রী দুর্য্যোধন কল্পিত জতুগৃহ হইতে মহামতি বিদুরের সাহায্যে পলায়ন করিয়া পাণ্ডবগণ সেই গভীর রজনীকালে নক্ষত্র সাহায্যে দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর জননীকে স্কন্ধে এবং সুকুমারদেহ নকুল ও সহদেবকে ক্রোড়ে লইয়া ধাবমান হইলেন। যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন অতি কষ্টে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা পরিশ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত ও নিতান্ত নিদ্রাতুর হইয়া সেই ভীষণ বনে এক বটবৃক্ষমূলে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন।

দেখিতে দেখিতে দুঃখময়ী যামিনীর অবসান হইল। প্রভাতের সুশীতল সমীরণস্পর্শে জীবকুল জাগরিত হইল; পক্ষিগণের কল-সঙ্গীতে অরণ্যানী কোলাহলময় হইল; নবোদিত প্রভাকরের বিমল কিরণে দিঙ্মণ্ডল লোহিতবর্ণ ধারণ করিল। সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রার কোমলস্পর্শে রজনীর শ্রান্তি অপনীত করিয়া কুন্তী ও পাণ্ডবগণ ভূমিশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। শরীরে নূতন বল ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। তখন পাণ্ডবগণ প্রাতঃকৃত্য

সমাপন করিয়া বল্কলাজিন পরিধান ও জটাবন্ধনপূর্ব্বক তাপসবেশ ধারণ করিলেন। সেই নবীনবেশে তাঁহাদিগকে ঋষিকুমার বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। অতঃপর তাঁহারা এক মনোহর তপোবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় শ্যামল পল্লবযুক্ত তরুরাজি পুষ্পিত ও ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। এলা ও লবঙ্গ লতার কুসুম-গন্ধে দশ দিক আমোদিত হইতেছে। (বৃক্ষ ও লতার সমাবেশে মধ্যে মধ্যে মনোমুগ্ধকর কৃত্রিম-কুঞ্জ নির্ম্মিত হইয়াছে; উহার অভ্যন্তর ভাগ অতি সুশীতল, তথায় দিনকরের কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না।) কোন স্থানে যজ্ঞবেদিকা স্থাপিত রহিয়াছে যজ্ঞীয় ধূমসমাগমে নবপল্লব সকল মলিন হইয়া গিয়াছে। তরু-শাখায় ঋষিদিগের পরিধেয় বল্কল শুকাইতেছে, কমণ্ডলু ও জপমালা ঝুলিতেছে; তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন বৃক্ষ সকলও তপস্বিবেশ ধারণ করিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুনি-বালকদিগের সুমধুর বেদধ্বনিতে সমস্ত তপোবন যেন সঙ্গীতময় হইয়া উঠিয়াছে। তাপসকন্যাগণ কক্ষে কলসী লইয়া আলবালে জলসেচন করিতেছেন; তাঁহাদিগের নির্ম্মল হাস্যধ্বনিতে তপোবন উৎসবময় বোধ হইতেছে। মুনিজনেরা কেহ তরুতলে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন, কেহ বা সন্ধ্যোপাসনার আয়োজন করিতেছেন। পাণ্ডবগণ তপোবনের এইরূপ অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে করিতে জননীর সহিত আশ্রম-তরুতলে উপবেশন করিলেন।

তপোবনের পবিত্র শোভা দর্শন করিয়া পাণ্ডবদিগের হৃদয়ের বিষাদ ও অশান্তি তিরোহিত হইল। তখন যুধিষ্ঠির প্রসন্নমনে জননীকে কহিলেন, "মা, দেখ দেখ, তপোবনের কি আশ্চর্য্য প্রভাব!

এখানে হিংসা, দ্বেষ, বৈরমাৎসর্য্য, কিছুই নাই! এখানে আসিলে চিরশোকগ্রস্তের শোক-সন্তাপ বিদূরিত হয়; মহাপাপীর অন্তরেও পবিত্র ভাবের সঞ্চার হয়।) এখানে একের সুখে অন্যের প্রাণ দগ্ধ হয় না, একের দুঃখে অন্যের হৃদয় পুলকিত হয় না। জ্ঞাতি-বিরোধ কাহাকে বলে তপোবনবাসিগণ তাহা স্বপ্নেও অবগত নহেন। মানুষের কথা দূরে থাকুক, এখানকার পশুপক্ষীরাও চিরাভ্যস্ত বৈরভাব পরিহার করিয়া কেমন প্রীতির সহিত একত্র বাস করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! ঐ দেখ, করভশিশু সিংহশাবককে শুণ্ডদ্বারা আকর্ষণ করিতেছে; মৃগগণ বৃকের সহিত একসঙ্গে বিচরণ করি-তেছে! (দেখিয়া বোধ হয় যেন, কলির আগমন সংবাদে ভীত হইয়া সত্যযুগ তপোবনে আশ্রয় লইয়াছে।)

তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় 'ভারত-পঙ্কজরবি' মহামুনি বেদব্যাস তথায় উপস্থিত হইলেন। মহর্ষির মূর্ত্তি অতি প্রশান্ত ও দিব্যলাবণ্যযুক্ত; জরাপ্রভাবেও দেহের কান্তি মলিন হয় নাই; শুভ্রজটাভারে মস্তক আচ্ছাদিত, পবিত্র কৃষ্ণাজিনে দেহ আবৃত। (তাঁহার গম্ভীরাকৃতি, সমুন্নত ললাটদেশ, তপোজ্জ্বল নয়নযুগল ও মুখমণ্ডলের পুণ্যপ্রভা দর্শন করিয়া বোধ হয় যেন, তিনি জ্ঞানের অবতার, করুণরসের প্রবাহ, ক্ষমা ও সন্তোষের আধার, সৎপথের প্রদর্শক ও সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়ভূমি!) সহসা তাঁহার আগমনে পাণ্ডবগণ হর্ষবিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তদীয় পাদবন্দনাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন।

কুন্তীদেবীও মহর্ষির পদধূলি গ্রহণ করিয়া আকুলনয়নে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। সমাতৃক পাণ্ডুপুত্রদিগকে অসহায়, অরণ্যচারী

ও তাপসবেশধারী দর্শন করিয়া মহর্ষির সমুদ্রবৎ গম্ভীর হৃদয়ও ঈষৎ আন্দোলিত হইল। তিনি বাষ্পাকুলনেত্রে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, 'বৎসগণ তোমরা বিষণ্ণ হইও না, পরিণামে ধর্ম্মেরই জয় হইবে।' অনন্তর কুন্তীকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "বৎসে, তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র নরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক। ইনি স্বীয় ধর্ম্মগুণে ও ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে সসাগরা ধরার অধিপতি হইবেন আপাততঃ যাহাই হউক না কেন, পরিণামে ধর্ম্মেরই জয় হইবে কদাচ ইহার অন্যথা হইবে না," এই বলিয়া মহর্ষি প্রস্থান করিলেন।

প্রশ্ন

১। তোমার নিজের ভাষায় তপোবনের শোভা বর্ণন কর।

২। জতুগৃহ, বেদব্যাস ও পাণ্ডবগণ সম্বন্ধে কি জান বল।

৩। নিম্নলিখিত দুরূহ শব্দগুলির অর্থ ও সমাসযুক্ত বাক্যের সমাস ও সমাসবাক্য বল।

অরণ্যানী, সর্ব্বসন্তাপনাশিনী, বল্কলাজিন, যজ্ঞবেদিকা, বৈরমাৎসর্য্য, কবভশিশু, ভারতপঙ্কজরবি, বাষ্পাকুলনেত্রে।

রাজর্ষি [redacted] সীরধ্বজ

প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য ও বর্ণনীয় বিষয়ঃ—পুণ্য-চরিত্রের অসাধারণ প্রভাব। তাঁহার সঙ্গগুণে পাপীগণও দেবত্বলাভ করে।

১। রাজর্ষি জনকের পরিচয়। ২। জনকের স্বর্গগমন পথে নরক সন্নিধানে অবস্থান। ৩। তাঁহার শরীরবায়ু স্পর্শে পাপীগণের যন্ত্রণার অবসান। ৪। পরিশেষে জনকের অসীম দয়ায় পাপিগণের মুক্তি।

পুরাকালে সুপ্রসিদ্ধ বিদেহ নগরে সীরধ্বজ নামে এক নরপতি ছিলেন। তৎকালে এই বিশ্রুতযশা নরপতির নাম ও কীর্ত্তিকথা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র, প্রত্যেক জনপদে, প্রত্যেক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের মুখে অহরহঃ কীর্ত্তিত হইত। সেই নরপতি কেবল যে ক্ষত্রিয়োচিত ভুজবীর্য্য, রাজনীতি কুশলতা এবং প্রজাপালন পদ্ধতিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যাবিৎ মহাজ্ঞানী পুরুষ তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও অতি বিরল ছিলেন। এই মহীপাল জিতেন্দ্রিয়, সদাচার-সম্পন্ন ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। নিয়ত ব্রহ্মোপাসনার ফলে তিনি যে সমস্ত অমূল্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয়ে ঋষিসমাজ তাঁহাকে রাজর্ষি উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ক্ষত্রিয় এবং রাজা হইলেও ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। তত্ত্বজ্ঞানবলে তিনি সর্ব্বপ্রকার ভোজ্যবস্তুকে নিয়ত পরিবেষ্টিত থাকিয়াও একদিকে তৎসমুদয়ে

যেমন একেবারে স্পৃহাশূন্য ছিলেন, তেমনই অপর দিকে প্রজাপালন ও রাজকার্য্য পরিদর্শনেও তুল্যরূপে অবহিত ছিলেন। এইজন্য জগতে তাঁহার মাহাত্ম্য অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।)

ব্রহ্মবিদ্যাচর্চ্চাবলে মহারাজ জনক ধনজনে রাজ্যসমৃদ্ধিতে পরিবৃত হইয়াও একজন নির্লিপ্ত ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া তৎকালে ভারতবর্ষে বিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

অযোধ্যাপতি মহারাজ রামচন্দ্রের মহিষী পতিপরায়ণতার আদর্শ সাধ্বী সীতাদেবী রাজর্ষি জনকের দুহিতা।

জনক যথাসময়ে যোগবলে তনুত্যাগ করিলে তাঁহার স্বর্গ গমনের জন্য এক দিব্য বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই রথে গমন করিতে করিতে যমরাজের সংযমিনীপুরী অতিক্রম করিবার কালে অতি করুণ প্রার্থনা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। "হে পুণ্যব্রত, এস্থান হইতে যাইবেন না। আমরা আপনার শরীরবায়ুস্পর্শে সুখী হইতেছি।" ঐ সময়ে যে সকল পাপাত্মারা অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল তাহারা পুণ্যচরিত জনকরাজের শরীর-সংসর্গী বায়ুস্পর্শে সুখলাভ করিতে লাগিল। নরকের দাহজনিত পীড়াও কষ্ট দিতে পারিল না। (পরম দয়ালু রাজর্ষি জনক তাহাদের কাতর প্রার্থনা শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে ভাবিলেন—যদি আমা হইতে এই প্রাণীদিগের সুখোদয় হয় তাহা হইলে আমি এই যমপুরে অবস্থান করিব, ইহাই আমার মনোরম স্বর্গস্বরূপ।) এই সময় ধর্ম্মরাজ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া মহাপুণ্যাত্মা করুণ-হৃদয় সেই নরপতিকে নরক সন্নিধানে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "রাজন্, তুমি পরম ধার্ম্মিক হইয়াও কি জন্য এখানে রহিয়াছ? যাহারা

গুরুতর পাপাচরণ করে মদীয় ভৃত্যগণ তাহাদিগকে এস্থানে আনয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু তাদৃশ ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করিতেও সমর্থ হয় না। জনক কহিলেন,—ধর্ম্মরাজ, আমি এই জীবগণের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়াছি, এজন্য এস্থান হইতে যাইতে পারিতেছি না। দেখুন ইহারা আমার শরীর-সমীরস্পর্শে সুখী হইয়াছে। আপনি যদি এই সমুদয় নরকবাসীদিগকে মুক্ত করিয়া দেন তাহা হইলে পরম সুখে পুণ্য জনাশ্রিত স্বর্গধামে গমন করিতে পারি।” তখন ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—রাজন্, ইহারা পাপী বলিয়া অগ্রে ইহাদিগকে পাপের ফলভোগ করাইয়া পরে মুক্ত করিয়া দিব।” তখন জনক পুনরায় ধর্ম্মরাজকে বলিলেন, “দেব, কিরূপে এই জীবগণ নরকযন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইবে ? যে কার্য্য করিলে তাহারা নরক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারে আপনি এক্ষণে তদ্বিষয় বলুন।” “তুমি যদি একান্তই এই পাপিষ্ঠদিগকে মুক্ত করিতে চাও তবে নিজ পুণ্য প্রদান কর।” ধর্ম্মরাজের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ জনক বলিলেন, ‘আমি আজন্ম সমুপার্জ্জিত স্বীয় পুণ্য প্রদান করিলাম।” তাঁহার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই নিরয়স্থিত জীবগণ তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইল। তখন সর্ব্বভূতে দয়াবান্ রাজা জনক সেই জীবগণকে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জাবৃত কলেবর দেখিয়া মনোমধ্যে নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পাপিগণের উদ্ধারের জন্য, পাপীর তীব্র যন্ত্রণা প্রশমিত করিবার জন্য প্রেমিক সাধুপুরুষগণ আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এই আত্ম-বিসর্জ্জনই প্রেমের ধর্ম্ম এবং প্রকৃত দেব-স্বভাবের লক্ষণ। আহা! পুণ্য চরিত্রের কি অসাধারণ প্রভাব! পুণ্যশীল জনের আবির্ভাবে নিখিল বিশ্ব ধন্য হয়। সাধারণ স্থান

মহাতীর্থে এবং নরক স্বর্গে পরিণত হয়। তাঁহার সঙ্গগুণে পাপিগণও দেবত্ব লাভ করে। ধন্য সাধুসঙ্গ! সাধুসঙ্গের কি অচিন্তনীয় মহিমা!

প্রশ্ন।

১। রাজর্ষিজনক, যমরাজ, ধর্ম্মরাজ, রামচন্দ্র ও সীতাদেবী সম্বন্ধে কি জান বল।

২। এই গল্প পড়িয়া কি শিখিলে?

৩। এই শিক্ষা আর কোন গল্পে কখন পড়িয়াছ বা শুনিয়াছ কি?

৪। নিম্নলিখিত দুরূহ শব্দগুলির অর্থ ও সমাস বল।

বিশ্রুতযশা, ব্রহ্মবিদ্যাবিৎ, তত্ত্বজ্ঞান, রাজকার্য্য-পরিদর্শন, নির্লিপ্ত, ত্বাদৃশ, আজন্মসমুপার্জ্জিত।

দুইখানি ছবি

প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য ও বর্ণনীয় বিষয়ঃ—সুরাপানের অপকারিতা, সুরাপান দেবতাকে পিশাচে পরিণত করে।

১। একজন চিত্রকরকর্ত্তৃক নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক দেবোপম শিশুমূর্ত্তি অঙ্কন। ২। কয়েক বৎসর পরে তৎকর্ত্তৃক পূর্ণ পাপমূর্ত্তি এক পুরুষ চিত্র অঙ্কন। ৩। পরিচয়ে প্রকাশ,—দেবশিশুর সুরাপান দোষে পূর্ণ পাপ-মূর্ত্তিতে পরিণতি। ৪। পাপের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে ও ভগবানে আত্ম সমর্পণ করিতে উপদেশ।

একজন চিত্রকর একটী নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক মূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার জন্য বহু দিন হইতে আগ্রহ করিতেছিলেন। একদিন কোন পথে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি সুকুমার শিশু দেখিতে পাইলেন।

তাহার প্রফুল্ল মুখকমল এত সুন্দর এত পবিত্র এবং এমন মনোহর যে এমন কমনীয় মানব-মুখ চিত্রকর আর কখনও দেখেন নাই।

তখন তিনি মনে করিতে লাগিলেন, আজ বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। আমি মনে মনে যাহা কল্পনা করিতেছিলাম, আজি তাহাই পাইয়াছি। ইহা স্থির করিয়া সেই অপূর্ব্ব শিশুর একটি প্রতিমূর্ত্তি লইবার জন্য তাহার মাতা-পিতার নিকটে প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা অনুমতি প্রদান করিলে, তিনি প্রফুল্লচিত্তে মনের মত করিয়া ছবি আঁকিয়া লইলেন, এবং অতি সুন্দররূপে বাঁধাইয়া নিজের বৈঠকখানায় টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। সেই ভুবন-মোহন চিত্র যে দেখিল সেইই চমৎকৃত হইয়া শতমুখে সেই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। স্বর্গীয় শান্তি এবং পবিত্রতা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া এই চিত্রে বিরাজমানা! চিত্রকরের যখন কোন কারণে মনে উদ্বেগ বা বিরক্তি জন্মিত, তখনই তিনি এই অপূর্ব্ব ছবিটী একাগ্রচিত্তে সন্দর্শন করিতেন; চিত্রস্থ শিশুর স্বর্গীয় শোভায়, অনুপম মাধুরীতে তাঁহার সকল অশান্তি বিদূরিত হইত।

কিছুদিন পরে আবার চিত্রকরের ইচ্ছা হইল, এই চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত একটী চিত্র চিত্রিত করিবেন। যেমন একটি পুণ্যের ছবিদ্বারা গৃহ সুশোভিত করিয়াছেন, তেমনি তাহার পার্শ্বে একটী পাপের ভয়ানক চিত্র রাখিয়া তাহাদের পার্থক্য অনুভব করিবেন।

অনেক বৎসর অতীত হইল, তথাপি তিনি পূর্ণ পাপমূর্ত্তি খুঁজিয়া পাইলেন না; পরিশেষে একদিন কারাগারে উপস্থিত হইয়া ভয়ঙ্কর পিশাচরূপী এক মানবমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাহার

মুখ যেমন শীর্ণ তেমনি কদাকার ও পাপাসক্তিপূর্ণ, চক্ষুযুগল যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে, গণ্ডস্থল যেন পাপকালিমায় কলঙ্কিত। মানুষের আকৃতি যে এরকম পিশাচের মত হইতে পারে ইহা চিত্রকরের কল্পনায়ও কোন দিন উদিত হয় নাই।

এই অভূতপূর্ব্ব পাপমূর্ত্তি দেখিয়াই চিত্রকর স্থির বুঝিলেন যে ইহা দ্বারাই তাঁহার অভীষ্ট সম্পূর্ণ সফল হইবে। তখন তাহার সেই ভীষণ মুখের এক চিত্র অঙ্কিত করিলেন; সেই ভয়ানক ছবি তাঁহার বৈঠকখানায় সেই শিশুমূর্ত্তির পার্শ্বে টাঙ্গাইয়া রাখিলেন।

যখন ছবি দুইটি পাশাপাশি স্থাপিত হইল, তখন তাহার পার্থক্য দেখিয়া দর্শকগণ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে লাগিল। দেবতা ও অসুরে যতটা প্রভেদ, স্বর্গ ও নরকে যতটা প্রভেদ, এই পুণ্যমূর্ত্তি শিশু এবং পাপমূর্ত্তি যুবকের চিত্রে ততটা প্রভেদ স্পষ্টই দেখা যাইতে লাগিল।

মানবমূর্ত্তি এ প্রকার বিভীষিকাপূর্ণ কিরূপে হইল, চিত্রকর এই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই ভীমদর্শন কারাবাসীর ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একান্ত যত্ন ও চেষ্টার ফলে তিনি যাহা অবগত হইলেন, তাহাতে তাঁহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। হায়! যে নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক সরল স্বর্গীয় মাধুরীময় শিশুর ছবি তাঁহার নয়ন ও মনের তৃপ্তি, আনন্দের প্রধান উপকরণ, যাহার সৌন্দর্য্য তিনি মানবের আদর্শ সৌন্দর্য্য বলিয়া জানেন, সেই অপূর্ব্ব শিশু এবং কদাকার ভয়ানক দর্শন পাপের প্রতিকৃতি স্বরূপ যুবক একই ব্যক্তি! ক্ষোভ, রোষ ও বিস্ময়ে চিত্রকর হতজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

এ অভাবনীয় পরিবর্ত্তন, এ দেবতার অসুরত্ব প্রাপ্তি কিরূপে হইল, কেহ জানিতে চাহ কি ? ইহার নিগূঢ় কারণ—একমাত্র কারণ সুরাপান ! মানব চরিত্র খুঁজিয়া দেখ, যত লোকের অধঃপতন হইতেছে, প্রায়ই কুসংসর্গ তাহার মূলকারণ। সেই হতভাগ্য কুসঙ্গে পড়িয়া সুরাপান করিতে আরম্ভ করে ; ক্রমে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া অধিকতর দুর্জ্জনদিগের সহবাসে, অধিকতর প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া, নানা দুষ্কার্য্য করে এবং নিজেও দুর্জ্জন হইয়া উঠে। সেই সকল দুষ্ক্রিয়ার ফলে তাহার [illegible]রাস ও পাপমূর্ত্তি সংঘটিত হইয়াছে।

যে বিধাতা তাহাকে সেই নিষ্পাপ ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য দিয়া জগতে পাঠাইয়াছিলেন তিনি বুঝি হতভাগ্যের পাপাচরণে ব্যথিত হইয়া ও ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অলৌকিক রূপরাশি কাড়িয়া লইলেন এবং তাহাকে এই পিশাচবৎ কদাকার করিয়া দিলেন। হতভাগা এই শাস্তি লাভ করিল।

মানব ! একবার তোমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ। আজি যাহাকে মহাপাপী বলিয়া শিহরিতেছ, যে হতভাগার চরমদণ্ড প্রাপ্তির কথা শুনিয়া চমকিত হইতেছ, যে পাপ-রাক্ষসের প্রীত্যর্থ স্বহস্তে কুসুম-কোরক তুল্য শিশু সন্তানকে হত্যা করিয়াছে জানিয়া স্তম্ভিত হইতেছ, সে একদিন নিষ্কলঙ্ক শিশু ছিল ; দশজনের মত কত স্নেহ, কত আদর, কত আশাভরসার সহিত সেও লালিত পালিত হইয়াছিল। হায় ! এই চিত্রিত যুবকের মত কুসংসর্গে পড়িয়া পাপের কুহকে তাহার কি সর্ব্বনাশ না হইয়াছে ! ভগবান্ তাহাকে যে সকল পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনার্থ জগতে পাঠাইয়াছিলেন, পাপ প্রলোভনে মজিয়া সে,—সে সবই ব্যর্থ করিয়াছে। মানব !

এই চিত্র ভাল করিয়া দেখ, দেখিয়া জীবন পথে সাবধান হও। ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গ কর, চরিত্র রক্ষার্থে প্রাণপণ কর, আত্মসংযম অভ্যাস কর, যেন তোমার জীবন এমন বিষময় না হয়।

পাপী তুমি যদি পাপের পথে পড়িয়া থাক, আর নহে, ফিরিয়া আইস। পতিত মানবকে উদ্ধার করিয়া থাকেন বলিয়াই জগদীশ্বরের নাম পতিত-পাবন। পাপকে পাপ বলিয়া মনে কর। যদি অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও তবে তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না, রক্ষা করিবেন। জগতের ইতিহাস খুঁজিয়া দেখ, কত সংসারের পরিত্যক্ত মহাপাপী দয়াময় বিধাতার দয়া পাইয়া ধন্য হইয়াছে। তুমি যদি অনুতপ্তচিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার দয়া ভিক্ষা কর তবে তুমি তাঁহার দয়া পাইবে। তাঁহার দয়া পাপীকেও প্রত্যাখ্যান করিতে জানে না।

প্রশ্ন।

১। এই গল্পের সার মর্ম্ম নিজ ভাষায় লিখ।

২। নিম্নলিখিত দুরূহ শব্দগুলির অর্থ বল ও পদপরিচয় দাও।

নিষ্কলঙ্ক, আকাঙ্ক্ষা, পার্থক্য, পাপাসক্তিপূর্ণ, বিভীষিকাপূর্ণ, উন্মীলন, কৌতূহলাক্রান্ত।

৩। এই গল্প পড়িয়া কি শিক্ষা লাভ করিলে?



সিদ্ধার্থের নগর ভ্রমণ

প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয় ঃ—১। সিদ্ধার্থের পর পর তিন দিন নগর পরিভ্রমণ এবং জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ ও তাহার ফলে তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের ক্রমবিকাশ বর্ণন। ২। ৪র্থ দিনের ভ্রমণে এক শান্ত নির্ব্বিকারচিত্ত প্রব্রজ্যাশ্রমীর সহিত সাক্ষাৎ ও উক্ত আশ্রম গ্রহণে অনুরাগ বর্ণন।

রাজা শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থের নগর ভ্রমণ বাসনা পরিজ্ঞাত হইয়া উহার অনুমোদন করিলেন এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন যেন নগর সুসজ্জিত করা হয়, কোলাহলের লেশমাত্র যেন না থাকে; অন্ধ অথবা পঙ্গু রোগী অথবা জরাজীর্ণ কোন ব্যক্তি রাজপুত্রের নয়ন-পথে যেন না পতিত হয়।

রাজাদেশ অনুসারে অমনই পথ পরিষ্কৃত হইল, পথে জল ছিটাইয়া দেওয়া হইল, দ্বারে দ্বারে পুষ্পমাল্য ঝুলিতে লাগিল, তুলসী ও মঙ্গল-ঘট গৃহে গৃহে স্থাপিত হইল, বৃক্ষে বৃক্ষে পতাকা উড়িতে লাগিল, কপিলবস্তু যেন ইন্দ্রভুবন হইয়া উঠিল।

যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে সিদ্ধার্থ সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া নগর দর্শনে বাহির হইলেন। দেখিলেন—কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া লোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে,—তাহাদের প্রসন্ন মুখকান্তি রাজভক্তিতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। সিদ্ধার্থ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "বড় সুন্দর পৃথিবী। আর এ দৃশ্য মনোহর বোধ হইতেছে। কি সরল উদার প্রকৃতি ইহাদের!" সিদ্ধার্থের রথ

ক্রমশই অগ্রসর হইতে লাগিল। তাঁহার পশ্চাতে অসংখ্য প্রজা "জয় জয়" বলিয়া চলিতে লাগিল। সহসা কোথা হইতে এক দীনহীন বৃদ্ধ কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিয়া সিদ্ধার্থ শিহরিয়া উঠিলেন ও সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,---'ছন্দক, এ কে ? অতি কষ্টে ধীরে ধীরে আসিতেছে---দণ্ডে ভর করিয়া চলিতেছে। বলহীন, স্থৈর্য্যহীন---মাংস, রুধির, চর্ম্ম সমস্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। দেহের শিরাগুলি দেখা যাইতেছে। কেশগুলি শ্বেতবর্ণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতি ক্ষীণ। ও যে বলিতেছে---'আমি মরি---আমি মরি'---ইহার অর্থ কি ?

ছন্দক বলিল, "ও আত্মীয়-স্বজনত্যক্ত জরাজীর্ণ বৃদ্ধ---উহার ইন্দ্রিয় ক্ষীণ হইয়াছে, বনমধ্যে জীর্ণ কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ঐ ব্যক্তি এখন অকর্ম্মণ্য হইয়া আছে।'

সিদ্ধার্থ বলিলেন, "এইরূপ জরাগ্রস্ত হওয়া কি উহার কুলধর্ম্ম, অথবা পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকেই ঐ অবস্থায় পড়িতে হইবে ? আমাকে যথার্থ উত্তর দাও---আমি ইহার কারণ নির্ণয় করিব।"

সারথি বলিল, "প্রভু, জরাগ্রস্ত হওয়া কেবল উহারই কুলধর্ম্ম নহে,---সংসারের সমস্ত প্রাণীই কালবশে জরা দ্বারা আক্রান্ত হইবে। সে আক্রমণ হইতে কেহই উদ্ধার পাইবে না।"

সিদ্ধার্থ কহিলেন, "মানুষ কি নির্ব্বোধ ! যৌবন-মদে মত্ত হইয়া কেহই আপনার বার্দ্ধক্য দেখিতে পায় না। রথ ফিরাও, আমি ঐ জরাগ্রস্ত লোকটিকে আবার দেখিব। আর খেলায় কি আবশ্যক---জরা ত' আমাকেও আক্রমণ করিবে।

সে দিনের মত ভ্রমণ শেষ হইল। আর একদিন ভ্রমণে বাহির

হইয়াছেন এমন সময় দেখিলেন, এক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার দেহ বিবর্ণ—ইন্দ্রিয় সকল বিকল—সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তির এরূপ দশা হইয়াছে কেন?"

সারথি উত্তর দিল—"এ ব্যক্তি ব্যধিগ্রস্ত—ইহার মৃত্যু আগত-প্রায়; ইহার শরীরে তেজ নাই, রক্ষা পাইবার আশা নাই দেখিয়া এ ব্যক্তি নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে।"

সিদ্ধার্থ বলিলেন, "আরোগ্য স্বপ্নের মত অলীক—ব্যাধি ভয়ঙ্কর এবং নিদারুণ সত্য। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কি ইহা দেখিয়া আমোদে রত থাকিতে পারেন?"

আর একদিন তিনি দেখিলেন, বাহকেরা মঞ্চে করিয়া একটী শব লইয়া যাইতেছে; সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহাকে মঞ্চের উপর লইয়া যাওয়া হইতেছে কেন? যাহারা সঙ্গে যাইতেছে তাহারা ব্যাকুল হইয়া রোদনই বা করিতেছে কেন?"

সারথি উত্তর দিল, "এই লোকটীর মৃত্যু হইয়াছে। ও আর আত্মীয়স্বজনগণকে দেখিতে পাইবে না—সকলকে ত্যাগ করিয়া উহার আত্মা পরলোক গমন করিয়াছে।"

সিদ্ধার্থ কহিলেন, "যৌবনকে ধিক্—জরা তাহার পশ্চাতে যান। জীবন অস্থায়ী—জীবনের গর্ব্বকে ধিক্। বুদ্ধিমান্‌কে ধিক্—তিনি মিথ্যা আমোদে রত থাকেন। জীবন অতি হেয়,—জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু আমাদের নিত্য সহচর। আমি দুঃখ মোচনের উপায় বিধান করিব।"

আর একদিন সিদ্ধার্থ উদ্যানে প্রবেশ করিতেছেন এমন সময় এক

শান্ত সংযত ব্রহ্মচারী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাষায়বস্ত্র পরিয়া ঐ যে ব্যক্তি আসিতেছেন উনি কে? উন্নতভাবও নহে, অথচ অবনতভাবও নহে, নির্ব্বিকার-চিত্ত, ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া ধীরে ধীরে আসিতেছেন?"

সারথি বলিল, "প্রভু! উনি ভিক্ষু, ভোগসুখ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন। উনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া আত্মার শান্তি অনুসন্ধান করিতেছেন।"

সিদ্ধার্থ বলিলেন, "জ্ঞানিগণ প্রব্রজ্যাশ্রমের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। ঐ আশ্রমে থাকিয়া আপনার ও পরের অশেষ প্রকার উপকার করিতে পারা যায়। ঐ আশ্রম গ্রহণ করিতে আমার রুচি জন্মিতেছে।"

প্রশ্ন

১। এই গল্প পড়িয়া কি বুঝিলে?

২। শুদ্ধোদন, সিদ্ধার্থ, ছন্দক, কপিলবস্তু ও ইন্দ্রভুবন সম্বন্ধে কি জান বল।

৩। নিম্নলিখিত দুরূহ শব্দগুলির অর্থ বল।

পরিজ্ঞাত, স্থৈর্য্যহীন, কাষায়বস্ত্র, নির্ব্বিকারচিত্ত, প্রব্রজ্যাশ্রম।



রামায়ণ গান

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ও বর্ণনীয় বিষয়ঃ—১,। বাল্মীকি কর্ত্তৃক কৌশলে কুশ-লবের সহিত রামচন্দ্র ও তাঁহার পরিজনবর্গের পরিচয় সংঘটন। ২। রামচন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞসভা বর্ণন। ৩। কুশ-লব ও রামচন্দ্রের আকৃতিগত সাদৃশ্য দর্শনে লোকের মনোভাব বর্ণন। ৪। ক্রমে পরিচয় সংঘটন।

মহর্ষি বাল্মীকি রামচরিত অবলম্বন করিয়া অতি অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহার দুই কোকিলকণ্ঠ তরুণবয়স্ক শিষ্য অতি মধুরস্বরে সেই কাব্য গান করে, কল্য প্রভাতে তাহারা রাজসভায় সঙ্গীত করিবে—এই সংবাদ নৈমিষাগত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত হইয়াছিল। এজন্য রজনী অবসন্না হইবামাত্র কি ঋষিগণ, কি নৃপতিগণ, কি অপরাপর নিমন্ত্রিতগণ, সকলেই সাতিশয় ব্যগ্রচিত্তে সঙ্গীতশ্রবণলালসায় রাজসভায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সে দিবসের সভায় সমারোহের সীমা ছিল না। রামচন্দ্র রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও লঙ্কাসমরসহায় সুগ্রীব-বিভীষণাদি সুহৃদ্বর্গ তাঁহার বামে ও দক্ষিণে যথাযোগ্য আসনে আসীন হইলেন। কৌশল্যা, কেকয়ী, সুমিত্রা, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি প্রভৃতি ঋষিপত্নীগণ সমভিব্যাহারে পৃথক্ স্থানে অবস্থিত হইলেন।

এইরূপে রাজসভায় সমবেত হইয়া সমস্ত লোক অভিনব বয়স্ক ও সুকুমার গায়কযুগলের কথা লইয়া আন্দোলন ও

কথোপকথন এবং নিতান্ত উৎসুকচিত্তে তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে মহর্ষি বাল্মীকি কুশ ও লব সমভিব্যাহারে সভাদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর যথাসময়ে মহর্ষির নিদেশক্রমে, কুশ ও লব বীণাযন্ত্র-সহযোগে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। বাল্মীকি পূর্ব্বেই কুশ ও লবকে এই শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন যে রামায়ণের যে সকল অংশে রামের ও সীতার পরস্পর স্নেহ ও অনুরাগের বর্ণন আছে, তোমরা অগ্র ঐ সকল অংশই বিশিষ্টভাবে গান করিবে। তদনুসারে তাহারা কিয়ৎক্ষণ গান করিবামাত্র, রামের হৃদয় দ্রবীভূত হইল এবং নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। রাম তাহাদের দুই সহোদরকে যত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই তাহারা সীতার তনয় বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতে লাগিল। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ইহাঁরাও তাহাদের কলেবরে রাম ও সীতার অবয়বসাদৃশ্য অবলোকন করিয়া মনে মনে নানা তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলেন। তদ্ব্যতিরিক্ত, সভাস্থ সমস্ত লোক একবাক্য হইয়া কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই দুই ঋষিকুমার যেন রামচন্দ্রের প্রতিকৃতিস্বরূপ; যদি বেশে ও বয়সে বৈষম্য না থাকিত, তাহা হইলে রামে ও এই দুই ঋষিকুমারে কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইত না। বোধ হয় যেন রাম দুই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কুমারবয়সে ঋষিকুমারবেশ অবলম্বন করিয়াছেন; এই বয়সে রামের যেরূপ আকৃতি ও রূপ-লাবণ্যের মাধুরী ছিল, ইহাদিগেরও অবিকল সেইরূপ দেখিতেছি। যাহা হউক, সভাস্থ সমস্ত লোক মোহিত ও নিস্পন্দভাবে অবস্থিত হইয়া একতানমনে

সঙ্গীত শ্রবণ ও অনিমেষনয়নে তাহাদের রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কুশ ও লবকে অবলোকন করিয়া তাহারা সীতাতনয় বলিয়া কৌশল্যার অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। তখন তিনি একান্ত অস্থিরচিত্তা হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসসহকারে, "হা বৎসে জানকি!" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া ভূতলে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। তদ্দর্শনে সকলে বিকলান্তঃকরণ হইয়া অশেষ যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

কৌশল্যার এইরূপ অস্থিরতা ও কাতরতা দেখিয়া অরুন্ধতীর আদেশানুসারে সমীপবর্ত্তিনী প্রতিহারী লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া কৌশল্যার অভিপ্রায় নিবেদন করিলে লক্ষ্মণ, কুশ ও লবকে সমভিব্যাহারে লইয়া কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যা, তাহাদের দুই সহোদরকে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহভরে বারংবার উভয়ের মুখচুম্বন করিলেন এবং 'হা বৎসে জানকি! তুমি কোথায় রহিলে', এই বলিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সুমিত্রা, ঊর্ম্মিলা প্রভৃতি সকলেই অশ্রুপাত, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। কুশ ও লব এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

কৌশল্যা কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সম্পূর্ণরূপে সন্দেহ-ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত, লক্ষ্মণকে কহিলেন বৎস! তুমি একবার মহর্ষি বাল্মীকিকে এই স্থানে আনয়ন কর। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি বাল্মীকি লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলে সকলে সমুচিত ভক্তিযোগ সহকারে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে পরম সমাদরে আসনে

উপবেশন করাইলেন। অনন্তর কৌশল্যা কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন্! আপনার এই দুই শিষ্য কে, কৃপা করিয়া সবিশেষ বলুন।” বাল্মীকি, যে দিবস লক্ষ্মণ সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া আইসেন, সেই অবধি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন এবং রামবিরহে সীতার কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহারও যথাযথ বর্ণন করিলেন। সমুদয় শ্রবণ করিয়া সকলেরই চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কৌশল্যা, শোকে একান্ত অভিভূতা হইয়া, “হা বৎসে জানকি! বিধাতা তোমার কপালে এত দুঃখ লিখিয়াছিলেন,” এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, সীতা অদ্যাপি জীবিত আছেন এবং কুশ ও লব যে তাঁহার তনয়, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় রহিল না।

এত দিনের পর আত্মপরিচয় লাভ করিয়া কুশ ও লবের অন্তঃকরণে নানা অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইতে লাগিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ কৌশল্যা, কেকয়ী ও সুমিত্রার এবং ঊর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি ও লক্ষ্মণের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল।

প্রশ্ন

১। নৈমিষ, কৌশল্যা, কেকয়ী, সুমিত্রা, ঊর্ম্মিলা, সুগ্রীব, বিভীষণ ও অরুন্ধতী সম্বন্ধে কি জান বল।

২। পশ্চাল্লিখিত শব্দগুলির অর্থ, সমাস ও সমাসবাক্য বল।

সঙ্গীতশ্রবণলালসা, লঙ্কাসমরসহায়, সমভিব্যাহারে, বৈলক্ষণ্য, অনিমেষ-নয়নে, বিকলান্তঃকরণ, প্রতিহারী, অনির্ব্বচনীয়।

৩। সাষ্টাঙ্গপ্রণাম কিরূপ? আর কয় রকম প্রণাম আছে?

———

পরিশ্রম

প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য ও বর্ণনীয় বিষয় ঃ—কেবল কল্যাণই পরিশ্রমের চরম ফল।

১। সংসারে যাহা কিছু চিত্তরঞ্জন সবই পরিশ্রমের ফল। ২। শারীরিক পরিশ্রমে শরীরের পুষ্টি, অভাবে পীড়া। ৩। কৃষিশিল্পাদি শরীরিক পরিশ্রমের কার্য্য হেয় নহে বরং উহাতে অপ্রবৃত্তিই দূষ্য ও নিন্দনীয়। ৪। অতিরিক্ত পরিশ্রম গর্হিত। ৫। সমাজবদ্ধ জীবমাত্রেরই সমাজের কল্যাণের জন্য পরিশ্রম করা উচিত। ৬। অর্থ ব্যয় ও মানসিক পরিশ্রমের দ্বারাও সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা যায়!

মনুষ্যেরা পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর ন্যায় অযত্ন-সম্ভূত অন্নাচ্ছাদন ও স্বভাবজাত বাসস্থান প্রাপ্ত হয় নাই; তাঁহাদিগকে নিজ-যত্নে ঐ সমুদয় উৎপাদন ও নির্ম্মাণ করিতে হয়। জগদীশ্বর যেমন ঐ সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করা মানুষের পক্ষে আবশ্যক করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তদুপযোগী শরীর ও মন প্রদান করিয়া এবং বাহ্য বস্তু সমুদায় তাঁহার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া সঙ্কেতে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, মনুষ্য আপনার শরীর ও মন পরিচালনপূর্ব্বক জীবিকা-নির্ব্বাহ ও সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ করিবেন। তিনি এই অশেষ কল্যাণকর অনুমতি সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া রাখিয়াছেন; তাহা পালন করিলেই সুখ, লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ।

অনেকে পরিশ্রম কেবল ক্লেশের বিষয় বোধ করেন; কিন্তু

এরূপ বিবেচনা করা কেবল ভ্রান্তির কর্ম্ম। কেবল কল্যাণই পরিশ্রমের চরম ফল। পরম শোভাকর প্রশস্ত অট্টালিকা, বিকসিত-পুষ্প-পরিপূর্ণ মনোহর পুষ্পোদ্যান, সুচিক্কণ চিত্ত-রঞ্জন পণ্য-পরিপূর্ণ আপণশ্রেণী, তড়িৎ সম বেগবিশিষ্ট বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় রথ, ধর্ম্ম-শাসন-সংস্থাপক পবিত্র বিচারস্থান, জ্ঞান-মহারত্নের আকরস্বরূপ বিদ্যা-মন্দির, পৃথিবীস্থ জ্ঞানিগণের জ্ঞান-সমষ্টিস্বরূপ পুস্তকালয় ইত্যাকার সমুদয় শুভকর বস্তুই কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের অসীম মহিমা পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে। পরিশ্রম যে পরিণামে সুখোৎপাদন করে, ইহা বিবেচক লোকেরা সহজে স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু পরিশ্রম যে কেবল পরিণামেই সুখোৎপাদক, এমন নহে—কর্ম্ম করিবার সময়েও বিশুদ্ধ সুখ সমুদ্ভাবন করে। অঙ্গ-সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে স্ফূর্ত্তিলাভ ও হর্ষোদয় হইয়া থাকে। শরীর চালনায় যে কিরূপ দুর্লভ সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা শিশুগণ বিশিষ্টরূপে অনুভব করিয়া থাকে। তাহারা মুহূর্ত্তমাত্র স্থির থাকিতে ভালবাসে না; গমন, ধাবন, কুর্দ্দন করিতে পারিলেই তাহারা আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়। যাঁহারা প্রতি দিবস সাত আট ঘণ্টা নিয়মিত পরিশ্রম করিয়া থাকেন, বিনা পরিশ্রমে এক দিবস ক্ষেপণ করাও তাঁহাদের পক্ষে সুকঠিন বোধ হয়।

শরীর সঞ্চালন না করিলে, পীড়িত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যাঁহারা এরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন যে, তাহাতে অঙ্গ-সঞ্চালনের আবশ্যকতা নাই, সুপণ্ডিত চিকিৎসকেরা তাঁহাদিগকে ব্যায়াম অথবা অন্যবিধ অঙ্গচালনা করিতে পরামর্শ

প্রদান করিয়া থাকেন। শরীরের ন্যায় মনেরও চালনা করা আবশ্যক; নতুবা মনোবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া যায়।

কেহ কেহ শারীরিক কর্ম্মকে নিন্দনীয় কর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করেন। লোকের কেমন বিপরীত বুদ্ধি—তাঁহারা লোক-যাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগী আবশ্যক হিতকারী কর্ম্মকে ক্লেশকর অপকৃষ্ট কর্ম্ম বিবেচনা করেন, আর অনাবশ্যক অলীক কার্য্য সমুদয় ভদ্রলোকের অনুষ্ঠানযোগ্য সুখদায়ক ব্যাপার বোধ করিয়া থাকেন; তাঁহারা কৃষি ও শিল্প প্রভৃতি জনসমাজের উপকারী অত্যাবশ্যক কর্ম্মসমুদয় কেবল কষ্টদায়ক নীচবৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করেন, কিন্তু মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া পশু বধ করা, সদ্বংশজাত সম্ভ্রান্ত লোকের অযোগ্য বিবেচনা করেন না। অবিবেচক অদূরদর্শী মনুষ্যদিগের এই সমস্ত অনিষ্টকর কুসংস্কার, করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়মের অনুগত নহে। যখন আমাদের লোকযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী যাবতীয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত, তখন তাহা কোনক্রমেই ঘৃণার বিষয় নহে। যাহা তাঁহার নিয়মের প্রতিকূল, তাহাই নিন্দনীয়; তাঁহার নিয়মের অনুকূল ব্যবসায় আদরণীয় ব্যতিরেকে কদাচ নিন্দনীয় হইতে পারে না।

যে বৃত্তি অবলম্বন করিলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালিত হয় এবং অন্যের উপাসনা তুচ্ছ করিয়া স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা নিন্দনীয় বৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, অতি প্রশংসনীয় ও পরম পবিত্র ধর্ম্ম। স্বহস্তে হলচালনা করা দূষ্য নহে, করপত্র ব্যবহার করাও নিন্দনীয় নহে। এতদ্দেশীয় বিষয়ী লোক যে সমস্ত ঔপাধিক লাভ-

দায়ীকা অর্থকরী বৃত্তিকে প্রধান বৃত্তি বলিয়া জানেন, সে সমুদয়ই দূষ্য ও নিন্দনীয়। ন্যায়পথাশ্রয়ী সরলস্বভাব কৃষক অন্যস্বোপোজীবী লক্ষপতি অপেক্ষা সহস্রগুণে আদরণীয় ও পূজনীয়। এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ কৃষকের বলীবর্দ্দ বিশিষ্ট পবিত্র পর্ণকুটীরের নিকট অধর্ম্মোপজীবী লক্ষপতির অশ্বরথ-শোভিনী চিত্তচমৎকারিণী প্রাসাদ-শ্রেণী মলিন বোধ হয়। এরূপ ঋজুস্বভাব বুভুক্ষু কৃষকের কদলী-পত্রস্থিত নিরুপকরণ তণ্ডুলগ্রাস, পরধনাপহারী বিভবশালী ধনাঢ্য-দিগের স্বর্ণপাত্রারূঢ় সুগন্ধ-পরিপূর্ণ সুস্নিগ্ধ ভোগ অপেক্ষা সহস্রগুণে বিশুদ্ধ ও তৃপ্তিকর। বহুকালাবধি এদেশীয় লোকের মনে কেমন কুসংস্কার জন্মিয়াছে, তাঁহারা ন্যায়-বিরুদ্ধ কুৎসিৎ কৌশলে অর্থোপার্জ্জন করিবেন, পরোপজীব্য অবলম্বন করিয়া তৃণ অপেক্ষাও লঘু হইবেন, অনাহারে শরীর জীর্ণ ও শীর্ণ করিবেন, তথাচ ঈশ্বরানুগত, ধর্ম্মানুগত শিল্পকর্ম্ম করিতে সম্মত হইবেন না।

নিয়মিত পরিশ্রম সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়োজনক ও সুখজনক বটে, কিন্তু উহার আতিশয্য অত্যন্ত অনিষ্টকর। বাস্তবিক লোকে নিয়মাতিরিক্ত পরিশ্রম করে বলিয়াই তাহাদের উহা কষ্টদায়ক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সম্ভবমত পরিশ্রম যেমন আবশ্যক, অতিরিক্ত পরিশ্রম তেমনি গর্হিত। তাহাতে শরীর দুর্ব্বল হয়, অন্তঃকরণ নিস্তেজ হয়, সুতরাং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকলও তেজোহীন হইতে পারে। আহার পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন কিঞ্চিৎকাল কর্ম্ম করা আবশ্যক বটে, কিন্তু নৈসর্গিক নিয়মানুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ পরিস্কৃত, পরিচ্ছন্ন থাকিয়া শরীর সুস্থ রাখিবার নিমিত্ত যে পরিমাণ

ভোজ্য-ভোগ্য সামগ্রী প্রয়োজনীয়, তাহা উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিতে অধিক পরিশ্রম আবশ্যক করে না। মনুষ্যেরা আপনাদের অতি প্রবল ভোগবিলাস চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ অনাবশ্যক দ্রব্যও আবশ্যক করিয়া তুলিয়াছেন। সেই সমুদায় আহরণার্থ ভোগবিলাসীদিগকেও অধিক অর্থব্যয় করিতে হয় এবং যাহারা উৎপন্ন ও প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। যদি লোকে ঐ সমস্ত নিষ্প্রয়োজন দ্রব্য লাভেব অভিলাষ পরিত্যাগ করে এবং সকলে প্রতিদিবস ন্যূনাধিক এক প্রহর কাল পরিশ্রম করে, তাহা হইলে সুখ-স্বচ্ছন্দে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইবার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

সকলের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থে সাধ্যানুসারে কর্ম্ম করা উচিত এবং যে সমস্ত জীব সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের স্বীয় সমাজের কোন না কোন প্রকার হিতকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকা বিধেয়। এই কল্যাণকর নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচলিত দেখা যায়। জগৎপিতা জগদীশ্বর যাবতীয় জন্তুকে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী সামর্থ্য দিয়াছেন। সকল সিংহই আপন আহার অন্বেষণ করে, এবং প্রত্যেক বিবরই নিজ নিকেতন নির্ম্মাণ-বিষয়ে সহায়তা করে। যে সকল জীব শ্রেণীভুক্ত হইয়া বাস করে, এক এক শ্রেণী এক এক কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকে, এবং তাহাদের মধ্যে একটিও বিনা পরিশ্রমে কালহরণ করে না; সুতরাং অন্যদায় আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে না। মধুমক্ষিকাদির মধ্যে কতকগুলি মধুপুষ্প আহরণ করে, অপর কতকগুলি মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, অবশিষ্ট কতকগুলি মধু সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত থাকে।

সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতানুরূপ কর্ম্ম করিলে সকলের ভারের লাঘব হয়। কিন্তু কেবল স্বহস্তে হলচালন ও খনিত্র ব্যবহার না করিলে যে সংসারের উপকার করা হয় না, এমত নয়। ধনশালী মহাশয়েরা আপনাদের অর্থব্যয় ও বুদ্ধি পরিচালন করিয়া সহস্র প্রকারে লোকের উপকার করিতে পারেন। তাঁহাদের এই উপায় দ্বারা জন-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক। এদেশীয় ধনবান্ ব্যক্তিরা অনেকেই যাদৃশ অলীক ব্যাপারে অর্থ ব্যয় করেন এবং যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সমধিক সময় নষ্ট করিয়া থাকেন, তাহা স্মরণ হইলে, দুঃসহ দুঃখতাপে তাপিত হইতে হয় এবং একেবারে স্বদেশের প্রতি বিরক্ত হইয়া স্বজাতীয় লোককে ধিক্কার দিতে হয়।

কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম, উভয়ই হিতকারী। যাঁহারা বুদ্ধি-বলে নূতন শিল্পযন্ত্র প্রস্তুত ও তৎসম্বন্ধীয় কোন অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারের মহোপকারী মহাশয় মনুষ্য। যাঁহারা বাচনিক উপদেশ দিয়া অথবা গ্রন্থ রচনা করিয়া লোকের ভ্রম নিবারণ, চরিত্র-সংশোধন ও জ্ঞানোন্নতি সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন তাঁহারা ভূলোকের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। যেমন ঊষালোকে সুকুমার অরুণপ্রভা পূর্ব্বদেশে প্রকাশিত হইয়া, উত্তরোত্তর পশ্চিম প্রদেশে বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ ঐ সমস্ত মহানুভব মনুষ্যের জ্ঞান ও কর্ম্মপ্রভাব ক্রমে ক্রমে দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইতে থাকে এবং জন-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়।

প্রশ্ন

১। নিম্নলিখিত দুরূহ শব্দগুলির অর্থ, সমাস ও সমাসবাক্য বল।

অযত্নসম্ভূত, বিকসিত-পুষ্প-পরিপূর্ণ, আপণশ্রেণী, ধর্ম্মশাসন-সংস্থাপক সমুদ্ভাবন, কুর্দ্দন, করপত্র, লোকযাত্রানির্ব্বাহোপযোগী, অন্যস্বোপজীবী, চিত্তচমৎকারিণী, পরোপজীব্য, বিকীর্ণ।

২। পরিশ্রম ক্লেশের বিষয় নহে, "কেবল কল্যাণই পরিশ্রমের চরম ফল" এই উক্তির সমর্থন করিয়া তোমার নিজের ভাষায় একটি প্রবন্ধ লিখ।

পুত্ত ও তাঁহার বীরজননী

প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয়ঃ—১। স্বাধীনতাপ্রিয় বীররাজপুত জাতির স্বদেশ রক্ষার্থে ও রমণীগণের জাতি, ধর্ম্ম ও বংশগৌরব রক্ষার্থে আত্মোৎসর্গের একটি বিবরণ। ২। ষোড়শ বর্ষীয় বীরবালক পুত্ত মাতা, ভগ্নী ও পত্নীর সহিত আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর।

সহস্রাধিক বৎসর মধ্যে যে সকল জাতি বীর গৌরবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তন্মধ্যে রাজপুতগণ অগ্রগণ্য। নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ঐ জাতি বীর গৌরবের উন্নত গ্রামে অবস্থান করিতেছিল। এমন কি রাজপুতজাতির মহাপ্রাণ বালকবর্গের এবং মহীয়সী বীরাঙ্গনাগণের গৌরবাত্মক বীরকীর্ত্তি ও অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের সত্য ঘটনা উপন্যাসের কাল্পনিক কাহিনীকেও

হীনপ্রভ করে। ঐ মহিমান্বিত জাতি বীরত্ব মহিমায় কতদূর মহীয়ান্ হইয়াছিল তাহারই সামান্য মাত্র পরিচয় প্রদর্শন জন্য বীর-বালক পুত্ত ও তাহার বীরজননীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী বিবৃত হইল।

মিবারের রাজধানী চিতোর রাজস্থানের সীমন্ত-সিন্দুর অথবা কণ্ঠমালার মনোহর মধ্যমণি। উহা মিবারজননী চতুর্ভুজার অধিষ্ঠান ভূমি, উহা রাজপুত-গৌরবের স্তম্ভস্বরূপ মহারাণাগণের পৈতৃক রাজধানী। শত্রুর আক্রমণে তিনবার চিতোরের মহা উৎসাদন সাধিত হয়, তন্মধ্যে আকবর কর্ত্তৃক যে শেষ উৎসাদন সম্পাদিত হয় তাহাতেই চিতোর জনশূন্য মহাশ্মশানে পরিণত হয়। স্থানান্তরের যোগ্য শোভন নগরোপকরণসমূহ আকবর আপনার ভাবী রাজধানী আকবরাবাদ সজ্জিত করিবার জন্য হরণ করেন।

আকবর চিতোর আক্রমণ করিলে তদানীন্তন মহারাণা কাপুরুষ উদয়সিংহ সপরিবারে চিতোর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। কিন্তু তখনও মিবার বীরশূন্য হয় নাই; ক্ষত্রিয়-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সহস্র সহস্র রাজপুত অচিরে বদ্ধপরিকর হইলেন।

চিতোরের বিখ্যাত সেনাপতি জয়মল্ল ও কৈলবারার তরুণ সর্দ্দার পুত্তের অধিনায়কতায় ক্ষত্রিয় বীরগণ অদ্ভুত বিক্রমে মোগল-সূর্য্য মহাবীর আকবরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সম্মুখ সমরে জয়াশায় সন্দিগ্ধ হইয়া আকবর কাপুরুষোচিত উপায়ে জয়মল্লের গুপ্তহত্যা সম্পাদন করিলে রাজপুতপক্ষ অনেক দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। তখন তরুণ বীর পুত্ত তাহাদের একমাত্র আশাস্থল হইলেন। পুত্তের বয়স সে সময় মাত্র ষোড়শ বৎসর।

স্থির হইল, বীরগণ আর একবার শেষ উদ্যম করিয়া বিজয়

লাভের চেষ্টা করিবেন; পরাজিত হইলে যথাশক্তি শত্রুবিনাশ করিয়া সমর-শয্যায় শয়ন করিবেন। আর মহিলাগণ জ্বলন্ত অনল-কুণ্ডে প্রবেশ করিয়া জাতি, ধর্ম্ম ও বংশগৌরব রক্ষা করিবেন। ইহাই রাজপুত-ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জহরব্রত।

ষোড়শ বর্ষীয় বীর মোগলের সহিত প্রাণান্তকর কঠোর যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। চিতোরের বিপদ লক্ষ্য করিয়া বীর-জননী একমাত্র কিশোর পুত্র পুত্তের যুদ্ধযাত্রা অনুমোদম করিলেন। অল্প-দিন হইল, পুত্তের পিতা চিতোর রক্ষার্থ আত্মদান করিয়াছিলেন। এখন পুত্তের বিলোপে পিতৃবংশ লোপ হইবে, মাতার ক্রোড় শূন্য হইবে। এ অবস্থায় তাঁহার জীবন তাঁহার বিধবা জননীর নিকট কতদূর মূল্যবান্ সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা, রাজপুত জাতির গৌরব রক্ষা এবং রাজপুত ললনা-গণের ধর্ম্মরক্ষা অপেক্ষা রাজপুত রমণীর নিকট আর কোনও উপরোধ গুরুতর হইতে পারে না। পুত্ত এই সকল মহাব্রত উদ্‌যাপন জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন, কঠোর যুদ্ধের কঠোরতর শেষফল অনুধ্যান করিয়াও মাতা পুত্রের যুদ্ধগমন অনুমোদন করিলেন এবং আপনি বীরসজ্জায় সজ্জিতা হইয়া ও কন্যা এবং পুত্রবধূকে স্বহস্তে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া উন্মাদিনী সমর-গীতি গাহিতে গাহিতে রাজপূত-বাহিনীর অনুবর্ত্তিনী হইলেন। অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিয়া বিলাপ করা অথবা ধর্ম্মরক্ষার্থ অনলকুণ্ডে আত্মদান করা অপেক্ষাও যথাসাধ্য শত্রু বিনাশ করিয়া সমর-সজ্জায় শয়ন করা বীর রমণীর অধিকতর আকাঙ্ক্ষিত হইল।

অচিরে মোগলদিগের সহিত ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল।

উগ্রবীর্য্যা ক্ষত্রিয়মহিলাদিগের তীক্ষ্ণ অসির অব্যর্থ সন্ধানে শত শত শত্রুশির রণভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। সম্রাট আকবর এই অদ্ভুত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত এবং মোহিত হইলেন। জীবন ও সম্মানে আঘাত না করিয়া সিংহিনীদিগকে ধৃত করিতে বহু আয়াস করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সম্পূর্ণ বিফল হইল। জয়াশা অসম্ভব হইলে তাঁহারা সমরে আত্মদান করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন।

আজ বালক পুত্রের প্রতাপে মৃত্যুরও বিভীষিকা উৎপন্ন হইল। আজ চিতোরের স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত প্রায়। তদুপরি সম্মুখে অন্তঃপুরসেবিতা, সুখোচিতা, স্নেহময়ী মাতা, ভগিনী, সহধর্ম্মিনী বিষম সমরে শত্রুকরে আত্মদান করিলেন। তাঁহার ইহজীবনের সকল সাধ ফুরাইল, সকল আশা কালসাগরে বিলীন হইল। তিনি প্রতিহিংসাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় শত্রুকটকে পতিত হইয়া অব্যাহত প্রতাপে শত্রুক্ষয় করিতে করিতে পরিশেষে শত্রুর শবরাশির উপর আপনি চিরদিনের জন্য শয়ন করিলেন। সেই দুর্দ্দিনে, ১২ই চৈত্র, রবিবাব, ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে চিতোর রক্ষার্থ সমবেত ক্ষত্রিয়গণ সকলেই এইরূপে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। অপরিমিত অর্থরাশি ধ্বংস করিয়া এবং সহস্র সহস্র পরাক্রান্ত সৈনিকের জীবন আহুতি দিয়া আকবর আজ মহাপ্রাকার বেষ্টিত জনপ্রাণীশূন্য এক সুবিশাল মহাশ্মশান উপহার পাইলেন। চিতোর বিজয়ীর করায়ত্ত হইল বটে, কিন্তু চিতোরবাসিগণ কেহই তাঁহার পদানত হইল না। এখন ইহাকে বিজয় বলিতে হয় বল, পরাজয় বলিতে হয় বল।

প্রশ্ন

১। বীরবালক পুত্তের কাহিনী বর্ণন কর।

২। আকবরের রাজত্বকালীন আর কোন রাজপুত বীরের নাম ও কাহিনী বর্ণন করিতে পার কি যিনি স্বদেশপ্রীতি ও বীর মহিমায় পুত্ত অপেক্ষাও বিখ্যাত ?

৩। পশ্চাল্লিখিত দুরূহ শব্দগুলির অর্থ বল ও পদ পরিচয় দাও।
প্রতিকূল, গ্রামে, বীরাঙ্গণাগণের, উৎসাদন. উন্মাদিনী, উগ্রবীর্য্যা, জর্জ্জরিত, মহাপ্রাকার।

৪। মিবার, চিতোর, আকবর জয়মল্ল, জহরব্রত—ইহাদের সম্বন্ধে কি জান বল।

বাঙ্গালীর খাদ্য

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ও বর্ণনীয় বিষয় :—খাদ্য সামগ্রীর ও খাদ্য সামগ্রী গ্রহণের প্রথার পরিবর্ত্তন ও সংস্কার দ্বারা বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবনত স্বাস্থ্য উন্নত করিবার প্রচেষ্টা।

১। খাদ্য সামগ্রীর প্রকৃতি বর্ণন। ২। কিরূপে বর্ত্তমান প্রচলিত খাদ্যের দোষে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিল। ৩। কিরূপ খাদ্য হইলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় তাহার বিবরণ।

খাদ্য ও স্বাস্থ্য অতি ঘনিষ্টভাবে সম্বদ্ধ। পুষ্টিকর খাদ্য পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ করিলে শরীর ও মন যে সুস্থ ও সবল থাকে তাহা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় না। খাদ্য অথবা তদন্তর্গত বিবিধ পুষ্টিকর পদার্থের কোন একটির অভাব, এমন,

কি অপ্রতুল হইলেও শরীর দুর্ব্বল, শীর্ণ এবং বিবিধ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে ক্ষয় বা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আবার প্রয়োজনাতিরিক্ত যে কোন খাদ্য গ্রহণ করিলেও শরীরস্থ পরিপাক যন্ত্রাদির অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু এবং দেহমধ্যে অপরিপাকজনিত বিকৃত বিষাক্ত পদার্থের সমাবেশ বা প্রাচুর্য্যবশতঃ গৌণে বা অগৌণে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া দেহ নানাবিধ উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

এই জীবন-মরণ সমস্যার সন্তোষকর পূরণের উপর সমগ্র মানব জাতির স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও সুখ-সাচ্ছন্দ্যলাভ নির্ভর করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ড, জর্ম্মণি, আমেরিকা প্রভৃতি বিজ্ঞানালোকোদ্ভা-সিত দেশে দেহযন্ত্রের উপর খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের প্রভাব সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা চলিতেছে। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার তুলনায় ভারতবর্ষ এ বিষয়ে বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। ফলতঃ শরীরের গঠন, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ বিষয়ে আমরা শোচনীয়ভাবে তাঁহাদের নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছি। দু-একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে। ১। লণ্ডনে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা হাজার করা ৭০ জনের অধিক নহে আর আমাদের কলিকাতা নগরীতে হাজার করা ৩০০ হইতে ৪০০ শিশু জন্মের পর এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইংলণ্ডের অধিবাসিগণের পরমায়ু গড়ে ৫২ বৎসর আর বাঙ্গালীর গড়ে ২৩ বৎসর মাত্র। শতায়ু বা দীর্ঘজীবী লোকের সংখ্যা ইয়ুরোপের তুলনায় বাঙ্গালা দেশে অতি অল্প। প্রকৃতির অনুগৃহীত রৌদ্রাতপ, বারিবায়ুবহুল আমাদের বাঙ্গালাদেশে উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই এই শোচনীয় অবস্থার সর্ব্বপ্রধান কারণ।

একই গ্রামের হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের বলবীর্য্যাধিক্যের কারণ মুসলমানের খাদ্যে রুটী মাংসাদি পুষ্টিকর পদার্থের প্রাচুর্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

খাদ্য আমাদের দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন, তাপসংরক্ষণ, বলবিধান এবং পরিশ্রমজনিত ক্ষয়ের পূরণ করে। বহু গবেষণা ও পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে আমাদের খাদ্য মধ্যে নিম্নলিখিত ছয় জাতীয় উপাদান বা সার পদার্থ যথাপরিমাণে থাকা একান্ত আবশ্যক। ইহাদের মধ্যে যে কোন উপাদানের অভাব অথবা উহার পরিমাণের অল্পতা বা আধিক্য ঘটিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া দেহ বিবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। এই সকল উপাদানের নাম ও আমাদের শরীরের গঠন-পরিচালনে তাহাদের প্রত্যেকের কার্য্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। খাদ্যের উপাদান বা সার পদার্থঃ—

১। ছানাজাতীয় উপাদান (প্রোটীন)।
২। স্নেহ বা মাখন, তৈল ও চর্বিবজাতীয় উপাদান।
৩। শর্করা বা শালিজাতীয় উপাদান (কার্বোহাইড্রেট্স্)।
৪। লবণজাতীয় উপাদান (সল্টস্ ও মিনারেল ম্যাটারস্)।
৫। জল (ওয়াটার)।
৬। ভাইটামিন ("এ", "বি", "সি" ভাইটামিন্স্)।

১। প্রোটীন বা ছানাজাতীয় উপাদান

আমাদের শরীরের অস্থি, পেশী ও শারীরিক যন্ত্রাদি (যাহা পেশী ও টিস্যুর সমবায়ে গঠিত) এবং রস, রক্ত প্রভৃতি প্রধানতঃ ছানা বা প্রোটীন জাতীয় উপাদান দ্বারা জল ও লবণজাতীয়

উপাদান সহযোগে গঠিত ও উৎপাদিত হয়। মাখন বা শর্করা জাতীয় উপাদানের এ কার্য্যে কোন উপযোগিতা নাই। সুতরাং নির্ব্বাচিত খাদ্যে প্রোটীন বা ছানাজাতীয় উপাদানের অল্পতা বা অভাব ঘটিলে আমাদের দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি নিবারিত হয়। তাহার ফলে শরীর জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মানসিক শক্তির হ্রাস হয়, কার্য্যে উৎসাহ ও প্রবৃত্তি থাকে না, এবং মাংসপেশীর পুষ্টি ও দৃঢ়তার অভাবে অধিক পরিশ্রমজনক কার্য্য করিবার সামর্থ্যের অভাব হয়। এতদ্ব্যতীত এই জাতীয় উপাদান কম হইলে দেহের রোগ-প্রতিষেধের ক্ষমতা ক্রমশঃ লোপ পায় এবং আমরা সংক্রামক ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কুক্ষিগত হইয়া পড়ি।

সাধারণ পরিশ্রমী একজন বাঙ্গালী যুবকের খাদ্যে দৈনিক অন্ততঃ দেড় ছটাক (তিন আউন্স) পরিমাণ প্রোটীন থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু সচরাচর দেখা যায় যে দুই তোলা অন্ন ও অতিরিক্ত শাকসবজী ভোজী বাঙ্গালীর দৈনন্দিন খাদ্যে এক ছটাকেরও কম থাকে।

ফলে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ও শক্তি দিন দিন হীন হইতেছে। বঙ্গদেশে বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালীর প্রোটীন জাতীয় প্রধান খাদ্য মাংস, মাছ, দুধ ও ছানা অত্যন্ত মহার্ঘ হইয়া পড়ায় আর লোকে ঐ সকল উৎকৃষ্ট খাদ্য যথোচিত পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারে না। পূর্ব্ববঙ্গে ঐ সকল খাদ্য এখনও সুলভ ও সহজ প্রাপ্য বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গীয় লোকের শরীর অধিকতর সুগঠিত, শক্তিসম্পন্ন এবং কষ্টসহিষ্ণু। উত্তর ভারতের লোকেরা প্রোটীন

প্রধান দাল, রুটী ও দুধ, ঘী অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে বলিয়া তাহারা এত বলিষ্ঠ।

কতকগুলি প্রোটীন জাতীয় প্রধান খাদ্য :—ছানা, দাল, মাংস, মৎস্য, ডিম্ব, বাদাম, চীনাবাদাম, আটা, ছাতু, নারিকেল শাঁস, কলাইসুটী, চাউল প্রভৃতি।

২-৩। স্নেহ ও শর্করা জাতীয় উপাদান

দুগ্ধ, মাখন, ঘৃত, চর্ব্বি, মাছের তেল এবং সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, নারিকেল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ তৈল স্নেহজাতীয় খাদ্যের অন্তর্গত।

শর্করা জাতীয় উপাদান সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) শ্বেতসার এবং (২) শর্করা। শর্করা আবার ইক্ষু-শর্করা, ফল-শর্করা, দুগ্ধ-শর্করা প্রভৃতি ভেদে বিভক্ত।

চাল, চিঁড়া, খই, মুড়ি প্রভৃতি ধান্যোৎপন্ন দ্রব্য, আটা, ময়দা, সুজি, ছাতু, প্রভৃতি গম-যবোৎপন্ন দ্রব্য এবং দাল, সাগু, এরারুট, আলু, মানকচু, কাঁচকলা ও অন্যান্য কতিপয় তরিতরকারি শ্বেতসার প্রধান খাদ্য।

গুড়, চিনি, মিছরি, মধু, দুগ্ধ, বীট, বিবিধ মিষ্ট ফলমূল, ইক্ষু রস, খেজুর রস, তালের রস, প্রভৃতির মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় শর্করা অল্পাধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে।

অধিক পরিমাণে মাখন ও শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিলে দেহে চর্ব্বি উৎপন্ন হইয়া দেহকে মোটা ও শ্রমবিমুখ করে। এই শ্রেণীর লোক শীঘ্রই বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়। অনেক

চিকিৎসকের মত যে আমাদের খাদ্যের দোষেই এদেশে বহুমূত্র রোগের এত প্রাদুর্ভাব।

শর্করা ও মাখন জাতীয় খাদ্য পেশী ও শারীরিক যন্ত্রাদির গঠন কার্য্যে মোটেই সহায়তা করে না; কেবল তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে মাত্র। শর্করা জাতীয় খাদ্যের ক্রিয়া মাখন জাতীয় খাদ্যের অনুরূপ; তাহা হইলেও কিন্তু ইহাদের একটি অন্যটির অভাব সম্পূর্ণরূপে পূরণ করিতে পারে না। এই দুই জাতীয় খাদ্যই যথোচিত পরিমাণে পূর্ণ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন। আমাদের দৈনিক খাদ্যের মধ্যে ১ ছটাক্ মাখন জাতীয় খাদ্য (মাখন, ঘৃত বা তৈল) এবং আধ সের পরিমাণ নির্জ্জল শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় উপাদান (চাল, দাল, আটা, ময়দা, সুজী, চিনি) থাকিলে আমরা স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় পরিশ্রমের কার্য্য সকল করিতে পারি।

আমাদের দেহের তাপ রক্ষার জন্য এবং দেহাভ্যন্তরস্থিত যন্ত্রাদির ক্রিয়া ও খেলাধূলা কাজকর্ম্ম প্রভৃতি বাহিরের যাবতীয় পরিশ্রম ঘটিত কার্য্য করিবার জন্য যে তাপ ও শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা আমরা স্নেহ বা মাখন ও শ্বেতসার-শর্করা জাতীয় খাদ্য হইতে প্রাপ্ত হই। পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে মাংস জাতীয় খাদ্য হইতে শারীরিক শক্তি উৎপন্ন হয় কিন্তু এক্ষণে উহা ভ্রান্ত সংস্কার বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। অবশ্য মাংস পেশীর গঠন ও ক্ষয়পূরণ প্রোটীন ব্যতীত অপর কোন উপাদান দ্বারা সম্পাদিত হয় না এবং হইতে পারে না; আর সবল ও পুষ্ট পেশী ব্যতীত শক্তির বিকাশ হয় না। সুতরাং স্নেহ ও শর্করা জাতীয় খাদ্য যথেষ্ট

পরিমাণে গ্রহণ করিলেও প্রোটীনের পরিমাণ কম হইলে দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন হয় না এবং দেহ শক্তিসম্পন্ন হয় না। এজন্য বাঙ্গালীর খাদ্যে শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় দ্রব্য অনেক স্থলেই যথেষ্ট পরিমাণ থাকিলেও এবং স্থল বিশেষে মাখন জাতীয় উপাদানের পরিমাণ প্রচুর হইলেও একমাত্র ছানাজাতীয় উপাদানের অল্পতা প্রযুক্ত বাঙ্গালী দিন দিন হীন-স্বাস্থ্য, দুর্ব্বল, নিস্তেজ ও শ্রমকাতর হইয়া পড়িতেছে।

৪। লবণজাতীয় উপাদান

দেহের অস্থি, রক্ত, রস প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য বিবিধ লবণজাতীয় উপাদানের প্রয়োজন। অস্থি গঠনে চুণ ঘটিত লবণের বিশেষ প্রয়োজন। আর আমাদের রক্তে যে অসংখ্য লোহিত রক্তকণিকা আছে, যাহা জীবনীশক্তির সর্ব্বপ্রধান উপাদান, লৌহ তাহার একটী প্রধান উপকরণ। এইরূপ সোডা, পটাশ, গন্ধক, ফস্‌ফরাস, আঁইওডিন প্রভৃতি মূল পদার্থ ঘটিত কয়েক প্রকার লাবণিক দ্রব্য আমাদের শরীরের গঠনে ও বিবিধ রস প্রস্তুত করণে ব্যবহৃত হয়। দুগ্ধে চূণ জাতীয় লবণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। পিঁয়াজ, থোড়, মোচা কাঁচকলা প্রভৃতির মধ্যে লৌহঘটিত লবণ প্রচুর। সবুজ শাকসবজীর মধ্যে চুণঘটীত ও অন্যান্য ক্ষারজ লবণ অধিক পরিমাণে থাকে। মাছ-মাংসে দেহ নির্ম্মাণোপযোগী সকল প্রকার লবণই আছে। এতদ্ব্যতীত আমরা বিভিন্ন খাদ্যের সহিত অল্প পরিমাণ সাধারণ লবণ স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করি। ইহার সাহায্যে ছানাজাতীয় খাদ্য জীর্ণ ও পরিপাক করিবার জন্য পাকস্থলীতে গ্যাষ্ট্রীক যুস নামক রস উৎপন্ন হয়।

৫। জল

আমাদের ওজনের তিন ভাগের প্রায় দুই ভাগ জল। মূত্র-ঘর্ম্ম প্রভৃতি নানা আকারে প্রায় ৭০।৮০ আউন্স পরিমিত জল প্রতিদিন আমাদের শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। খাদ্যদ্রব্যের সহিত এবং পানীয়রূপে জল গ্রহণ করিয়া আমরা দেহ নির্গত জলের অভাব পূরণ করি। রস ও রক্ত প্রভৃতি দেহস্থিত তরল পদার্থের ত কথাই নাই, পেশী ও সর্ব্ববিধ দেহ যন্ত্রের গঠনে জলের সর্ব্বদা প্রয়োজন। জীর্ণ খাদ্যকে তরল করা, দেহমধ্যে উৎপন্ন ও সঞ্চিত যাবতীয় দূষিত ও বিষাক্ত আবর্জ্জনাকে দূর করা এবং খাদ্যের অজীর্ণ অসার অংশকে মলরূপে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া জলের আর একটি প্রধান কার্য্য।

আমাদের পান ভোজনে ব্যবহৃত জল বিশুদ্ধ হওয়া কত প্রয়োজনীয় তাহা উপরোক্ত বিবরণ হইতে উপলব্ধি করা যায়। বিশুদ্ধ জল প্রকৃতির অযাচিত দান। বিশুদ্ধ জল অতি অল্প আয়াসেই অধিকাংশ স্থলে সংগ্রহ করা যায়। অবিশুদ্ধ জল অগ্নির উত্তাপে ফুটাইয়া লইলেও ব্যবহারযোগ্য হয়। বড়ই দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের—বিশেষতঃ পল্লীগ্রামস্থ, শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিশুদ্ধ জলের উপকারিতা জানিয়াও বিশুদ্ধ জল সরবরাহ ও ব্যবহারের যথোচিত প্রয়াস পান না। ফলে দেশ সংক্রামক ও নানাবিধ ব্যাধিতে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। একমাত্র বিশুদ্ধ জল ব্যবহারের দ্বারা কলেরা, টাইফয়েড, রক্তামাশয় ও ম্যালেরিয়ার গ্রাস হইতে অর্দ্ধেক পরিমাণ মুক্ত হওয়া যায়।

৬। ভাইটামিন

খাদ্যের ষষ্ঠ ও দেহের পুষ্টি সহায়ক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। প্রোটিন প্রভৃতি অন্যান্য সার পদার্থের সহিত আমাদের খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামিন নামক পদার্থ থাকা আবশ্যক। খাদ্যে ভাইটামিন না থাকিলে প্রোটীন প্রভৃতি সার পদার্থের প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি সত্ত্বেও আম্মাদের শারীরিক বৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভের ব্যাঘাত ঘটে, স্বাস্থ্যরক্ষার হানি হয় এবং কতকগুলি কঠিন রোগ আক্রমণ করে। ভাইটামিন অভাবে আমাদের দেহের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতারও অপচয় ঘটে। ভাইটামিনই খাদ্যের প্রোটীনাদি বিভিন্ন জাতীয় সার পদার্থগুলিকে শরীরের গঠন ও পোষণ কার্য্যের উপযোগী করিয়া তুলে.।

বর্ত্তমান সময়ে প্রধানতঃ তিন জাতীয় ভাইটামিনের অস্তিত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ভাইটামিন "এ", ভাইটামিন "বি", ভাইটামিন "সি"। প্রথমটীর অভাবে শারীরিক পুষ্টি ও বিকাশ নিবারিত হয় এবং নেত্ররোগ, রিকেট্স্ প্রভৃতি জন্মে। দ্বিতীয়টীর অভাবে দেহ বৃদ্ধির অন্তরায় ঘটে এবং বেরিবেরি নামক উৎকট রোগ জন্মে। তৃতীয় ভাইটামিনের অভাবে স্কার্ভি নামক দুশ্চিকিৎস্য রোগ উৎপন্ন হয়।

আমাদের অনেক খাদ্যে এই তিন জাতীয় ভাইটামিনই অল্পাধিক পরিমাণে একত্রে অবস্থিতি করে। কোন কোন খাদ্যদ্রব্যে মাত্র একটি বা দুইটির অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। আবার কতকগুলি খাদ্যদ্রব্যে বিশেষতঃ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের অধিকাংশ-গুলিতে, যথা—পরিষ্কৃত চিনি, কলেছাঁটা সাদা চাউল, ধব্ধবে

সাদা কলের ময়দা ও তদ্দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য, সাগুদানা, টিনের কৌটায় রক্ষিত মৎস্য, মাংস, জ্যাম, জেলী, কৃত্রিম শিশুখাদ্য প্রভৃতিতে ভাইটামিন একেবারেই পাওয়া যায় না। এজন্য এইগুলি খাদ্যদ্রব্য মধ্যে অতি অপকৃষ্ট এবং যথাসাধ্য ইহাদের ব্যবহার নিবারিত হওয়া উচিত।

কাঁচা বা বলকা দুগ্ধ (বহুক্ষণ অগ্নির প্রবল উত্তাপে থাকার জন্য ক্ষীরে ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়), ঘৃত, মাখন, আটা, কডলিভার অয়েল, কমলালেবু, বিলাতি বেগুন; গোঁড়ালেবু, ডিম্বের পীতাংশ, মৎস্য, মাংস, বাঁধাকপি, পালংশাক, লেটুস প্রভৃতি পদার্থে "এ" জাতীয় ভাইটামিন প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি করে। খাদ্যদ্রব্যে এই জাতীয় ভাইটামিনের অভাব হইলে দেহের পুষ্টি ও বিকাশ ব্যাহত এবং শিশুদিগের রিকেটস্ নামক অস্থি-ব্যাধি হয়।

যাঁতা ভাঙ্গা আটা, গমের ভুষি, আছাঁটা বা অল্পছাঁটা চাউল, চাউলের কুঁড়া, মকাই, জোয়ার, নানাবিধ দাল, অঙ্কুরিত আস্ত ছোলা, মটর প্রভৃতি শস্য, দধি বা ঘোল, ডিম্বের পীতাংশ, মৎস্য, মাংস, বাদাম, আখরোট প্রভৃতি শুষ্ক ফল, চীনাবাদাম, নারিকেল শাঁস, কমলালেবু, কলাইশুঁটী, বরবটি, পিঁয়াজ, পালংশাক, টমাটো প্রভৃতি মধ্যে "বি" জাতীয় ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই জাতীয় ভাইটামিনের অভাবে দুরারোগ্য বেরিবেরি রোগ জন্মে; স্নায়ুকোষের পুষ্টির ব্যাঘাত হয় এবং পরিশ্রম করিবার শক্তি নষ্ট হয়।

কমলালেবু, গোঁড়ালেবুর রস, পাতি বা কাগজিলেবু, বিলাতি

বেগুন, বাঁধাকপি, পালংশাক, কলাইশুঁটী, আলু ও অন্যান্য টাট্‌কা তরিতরকারী, শাকসবজী ও রসাল ফলমূলের মধ্যে ভাইটামিন "সি" প্রচুর পরিমাণে আছে। খাদ্যে এই জাতীয় ভাইটামিনের অভাবে স্কার্ভি নামক উৎকট রোগ উৎপন্ন হয় এবং দেহের বৃদ্ধি সাধনের ব্যাঘাত ঘটে। কমলালেবু, পালংশাক ও বিলাতি বেগুনে তিন জাতীয় ভাইটামিনই অত্যধিক পরিমাণে আছে।

ভাইটামিনের সাহায্যে আমরা খাদ্য মধ্যস্থিত প্রোটীন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় সার পদার্থ বিভিন্ন কার্য্যে উপযুক্তরূপে লাগাইতে সমর্থ হই। ভাইটামিনগুলি পরস্পর পৃথক্ গুণসম্পন্ন। স্বাস্থ্যরক্ষা কার্য্যে ইহাদের একটি অপরটির স্থান অধিকার করিতে পারে না। পূর্ণ স্বাস্থ্যরক্ষা ও দেহের সম্যক্ বৃদ্ধির জন্য সকল জাতীয় ভাইটামিনের দেহমধ্যে অবস্থিতি একান্ত আবশ্যক। মাংসপেশী ও দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলি, যথা—যকৃৎ, মূত্রগণ্ড ও অন্যান্য গণ্ড মধ্যে ভাইটামিন অবস্থিতি করে।

"এ" জাতীয় ভাইটামিন যে শুদ্ধ রিকেট রোগ নিবারণ করে তাহা নহে। ইহা দ্বারা আমাদের দেহের সম্যক্ পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধিত হয়; দেহের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বৰ্দ্ধিত হয়। "বি" জাতীয় ভাইটামিন দ্বারা দেহস্থ কোষ সমূহের বিশেষতঃ স্নায়ুকোষের পুষ্টিসাধন এবং তাহাদের ক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধিত হয় ও ইহার অভাবে বেরিবেরি রোগোৎপত্তি হয়। এতদ্ব্যতীত ইহা শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাকের ও উহাকে দেহের কার্য্যে লাগাইবার সহায়তা করে। "সি" জাতীয় ভাইটামিন আমাদের দেহের বৃদ্ধি সাধনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। দেহের বৃদ্ধি সাধনের জন্য দেহের

মধ্যে যে সকল রাসায়নিক ক্রিয়া উপস্থিত হয়, "সি" জাতীয় ভাইটামিন সাহায্যে তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

আমাদের দেহ মধ্যে ভাইটামিন স্বভাবতঃই অল্প পরিমাণ থাকে। নিয়মিতভাবে রৌদ্র সেবন করিলে দেহমধ্যে ভাইটামিনের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ফলমূল শাকসব্জি কিয়ৎক্ষণ রৌদ্রে রাখিলে উহার মধ্যে ভাইটামিনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, তবে অতিরিক্ত রৌদ্রে একেবারে শুষ্ক করিয়া লইলে ভাইটামিন অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য নির্ব্বাচন করিবার সময় উহার মধ্যে ভাইটামিনের পরিমাণ কিরূপ তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। যে সকল দ্রব্যে ভাইটামিন অধিক তাহা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

ক্ষার পদার্থ সংযোগে ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য অধিক সোডা ব্যবহার বা সোডা মিশ্রিত জলে রন্ধন করা উচিত নহে। অধিক অগ্নির উত্তাপে ভাইটামিন, বিশেষতঃ "সি" জাতীয় ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এজন্য রন্ধন করিবার সময় তরকারী প্রভৃতি যাহাতে ৪০।৪৫ মিনিটের বেশী অগ্নি-সংযোগে না থাকে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

দুগ্ধ বা দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত, মাখন, ছানা, দধি, ঘোল সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য: ইহাতে সকল প্রকারের ভাইটামিনের সহিত ছানা, শর্করা, স্নেহ ও লবণ জাতীয় দেহের বৃদ্ধি ও পোষণোপোযোগী সকল শ্রেণীর সার পদার্থের সমাবেশ আছে। বাঙ্গালীর খাদ্যে খাঁটি দুগ্ধের অভাবই বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য অবনতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ, একথা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

বহু পরীক্ষার পর স্থির হইয়াছে যে একজন সুস্থকায়. বাঙ্গালী যুবকের জন্য দেড় ছটাক নির্ম্মল ছানাজাতীয়, এক ছটাক মাখন জাতীয়, সাড়ে আট ছটাক শ্বেতসার শর্করা জাতীয় ও আধ ছটাক লবণজাতীব উপাদান প্রতিদিন প্রয়োজন এবং এজন্য প্রতিদিন চাউল তিন ছটাক, আটা বা ময়দা পাঁচ ছটাক, দাল দেড় ছটাক, মাছ মাংস আড়াই ছটাক, তরকারি ৪।৫ ছটাক, ঘী ও তেল এক ছটাক, দুগ্ধ আট ছটাক ও জল যথা পরিমাণ গ্রহণ করা আবশ্যক।

দুই বেলা সিদ্ধ কলছাঁটা চাউলের অন্নগ্রহণ না করিয়া এক বেলা আতপ বা অল্প সিদ্ধ ঢেঁকী ছাঁটা চাউলের অন্ন, আর একবেলা আটার রুটী ও তৎসহিত ঘন সুসিদ্ধ দাল এবং অল্প কিছু তরকারি প্রধান খাদ্যরূপে এবং খৈ, মুড়কী, চিঁড়া ছাতু, ছোলা, মুগ, নারিকেল, চীনাবাদাম ও তদুৎপন্ন দ্রব্যাদি এবং সহজপ্রাপ্য ফলমূল জলখাবাররূপে প্রত্যহ ব্যবহার করিলে আমাদের খাদ্যে প্রোটীন ও ভাইটামিনের অভাব হয় না অথচ ব্যয়ও বেশী পড়ে না। অবস্থাপন্ন লোকে যথোচিত পরিমাণে দুধ, মাছ ও মাংস ব্যবহার করিতে পারেন।

প্রশ্ন

১। স্বাস্থ্য ও শক্তির সহিত খাদ্যের কি সম্বন্ধ?

২। বাঙ্গালীর বর্ত্তমান খাদ্য নির্ব্বাচনের কি দোষ? কিরূপ পরিবর্ত্তনে অল্প ব্যয়ে উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য পাওয়া যায়?

৩। ব্যবহৃত জল বিশুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন কেন?



সৈয়দ আমীর আলী

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ও বর্ণনীয় বিষয় ঃ—সৈয়দ আমীর আলীর জীবন পাঠে আমরা শিক্ষা পাই যে প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক ঘটনার মধ্যে থাকিতে হইলেও, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের প্রতি ভালবাসা থাকিলে আমরা সাধনাবলে স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের অনেক উপকার করিতে পারি।

ইসলাম গৌরবের চিরপতাকাধারী, মহামনীষী, জ্ঞানবীর সৈয়দ আমীর আলী অল্প দিন হইল মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে ও কার্য্যে শুধু মুসলমান সমাজের নহে ভারতীয় সকল সমাজের লোকেরই শিখিবার বিষয় যথেষ্ট আছে।

তাঁহার মাতা য়ুরোপীয় মহিলা, তাঁহার সহধর্ম্মিনীও য়ুরোপীয় ; খৃষ্টান সভ্যতায় দীক্ষিত পরিবারে তাঁহার জন্ম, য়ুরোপীয় পরিচালিত বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া য়ুরোপে তিনি শিক্ষা সমাপন করেন। য়ুরোপীয়ের অধীনে, য়ুরোপীয়গণের সাহচর্য্যে তাঁহার প্রায় সমগ্র কর্ম্মজীবন অতিবাহিত হয়। য়ুরোপীয় বিদ্যায় তিনি অসীম পারদর্শিতা লাভ করেন। এইরূপে য়ুরোপীয় শিক্ষা, সভ্যতা ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আজন্ম থাকিয়াও আমীর আলী একজন খাঁটী মুসলমান ছিলেন এবং নিজের জীবনে জাতি ও ধর্ম্মের আদর্শকে শুধু যে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন তাহা নহে, জাতীয় গৌরবকে সমগ্র জগতের সম্মুখে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বিশেষত্ব। সত্যই একাধারে

এত বড় উদার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যবহারজীব, এত বড় মনীষী ও মনস্বী, এত বড় কর্ম্ম ও ধর্ম্মবীর বর্ত্তমান জগতে দুর্লভ।



হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়ায়, বিখ্যাত সৈয়দবংশে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল, আমীর আলী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সাদাৎ আলী অযোধ্যার নবাব-সরকারে কর্ম্মত্যাগ করিয়া চুঁচুড়ায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ দিল্লীর রাজদরবারে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

বাল্যকালে তিনি হুগলী কলেজে প্রবেশ করেন ও বরাবর

তথায় শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ১৮ বৎসর বয়সে বি, এ, ও পরে এম, এ, ও বি, এল পরীক্ষা সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। দানবীর মহম্মদ মহসীন প্রদত্ত অর্থ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত ছাত্রগণের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতী ছাত্র।

আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করেন। তৎপরে ভারতগভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত "ষ্টেট্ স্কলারশিপ্" বৃত্তি লাভ করিয়া আইন অধ্যয়ন সমাপন করিবার জন্য ইংলণ্ড গমন করেন। ১৮৭৩ অব্দে মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া এদেশে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। অল্পদিন পরেই তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে মুসলমান আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও ১৮৭৮ অব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরকাল ঐ কার্য্য করেন। এই সময় হইতেই তিনি মুসলমান সমাজের হিতার্থে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৭৬ অব্দে তিনি "সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল ম্যাহোমেডান এসোসিয়েশন" নামক সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া দীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল উহার সেক্রেটারী-রূপে মুসলমান সমাজের নানারূপ হিতসাধন করেন। ১৮৭৬ হইতে ১৯০৪ পর্য্যন্ত তিনি "হুগলী-ইমামবারা-সমিতির" সভাপতি ছিলেন।

পাঁচ বৎসরকাল আইন ব্যবসায় ও আইন অধ্যাপকের কার্য্য করার পর তিনি ১৮৭৮ অব্দে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে বৃত হন। কিছুদিন পরেই তিনি উক্ত রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া আবার হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত যশ ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ অব্দে তিনি "ঠাকুর ল প্রফেসর" নিযুক্ত হন এবং তাঁহার প্রসিদ্ধি, বিচারবুদ্ধি, মুসলমান

আইনে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দর্শনে ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ল্যান্সডাউন ১৮৯০ অব্দে তাঁহাকে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত করেন। বাংলাদেশে তিনিই প্রথম মুসলমান ব্যারিষ্টার ও হাইকোর্টের প্রথম মুসলমান বিচারপতি। এই নিয়োগের পূর্ব্বে তিনি বঙ্গীয় ও ভারত গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন।

ইসলামীয় আইন-জ্ঞানে তিনি আজও একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারবিদ-রূপে জগতে পরিগণিত। বিচারপতিরূপেও তিনি উদার, ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসরকাল হাইকোর্টে বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া ১৯০৪ অব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ ইংলণ্ডে কাটাইবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া তথায় বসবাস আরম্ভ করেন। লণ্ডনের কোলাহল হইতে দূরে বার্কসায়ারের এক নিভৃত অঞ্চলে উদ্যান, সরোবর ও পর্ব্বতমালা পরিবেষ্টিত একটী সুন্দর ভবন তিনি নিজ বাসভবনরূপে মনোনীত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভারত ত্যাগে ভারতীয় মুসলমান-সম্প্রদায় অনেকেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার নেতৃত্ব ও সাহচর্য্য অভাবে ভারতীয় মুসলমান সমাজ যথেষ্ট রিক্ত হইয়াছিল; ভারত ত্যাগ করিয়াও কিন্তু তিনি ভারতীয় মুসলমান সমাজের হিতচিন্তা ও হিতানুষ্ঠান করিতে কখনও বিরত হন নাই। অধিকন্তু "দি স্পিরিট অব ইসলাম" ও "দি হিষ্ট্রী অব দি স্যারাসেনশ" নামক অমূল্য গ্রন্থদ্বয় লিখিয়া সে ক্ষতি তিনি পূর্ণ মাত্রায় পরিপূরণ করিয়া বৃহত্তর

ইসলামের ভাণ্ডারে দান করিয়া গিয়াছেন। দানের ক্ষমতা যাঁহাদের অসীম, স্থানের প্রতিবন্ধক তাঁহাদের নাই। সূর্য্য যত দূরেই থাকুক তাহার জ্যোতিতে সমগ্র বিশ্ব আলোকিত হয়।

তাঁহার রাজকীয় কর্ম্ম-জীবনের শেষ ও চরম গৌরব, ভারতবাসীগণের চিন্তারও অগোচর, "প্রিভী কাউন্সিলের" সভ্য পদ লাভ। প্রিভী কাউন্সিল সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের শেষ ও সর্ব্বোচ্চ বিচার স্থান ও ইহার সভ্যপদ সমগ্র বৃটিশ রাজত্বের ব্যবহারবিদগণের কাম্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন। প্রিভী কাউন্সিলের বিচারকরূপেও তিনি অসামান্য যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

মোসলেম-লীগের ইংলণ্ডস্থিত শাখার সভাপতিরূপে আমীর আলী ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ও লর্ড মরলীর সহিত বহুকাল বহু বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া ভারতের রাজকার্য্যে ভারতীয় মুসলমানগণের অধিকতর নিয়োগের দাবী প্রতিষ্ঠিত করেন ও "মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারে" মুসলমানগণের জন্য সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ও নিয়োগের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন। এ মহদুপকারের জন্য ভারতীয় মুসলমানগণ চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

রাজনৈতিক জীবনে আমীর আলী শুধু ভারতীয় মুসলমান সমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন। তাঁহার প্রতিভা ও উদ্যম তিনি সমগ্র মোসলেম জগতের সেবার জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তুরস্ক-ইতালীয় ও তুরস্ক-বল্কান সমরের সময় তাঁহারই উদ্যোগে ও চেষ্টায় আহত সৈন্যদের সেবার নিমিত্ত "বৃটিশ-রেডক্রেসেণ্ট" দল তুরস্কে প্রেরিত হয় এবং এই দলের অর্থ সংগ্রহ জন্য তিনি বার্দ্ধক্যেও যৌবনোচিত উদ্যমে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেন। মহাসমরান্তে

ইংরাজ, তুরস্ক ও পারস্যকে ভাগ করিবার উদ্যোগ করিলে, তিনি তুরস্ক এবং পারস্যের স্বপক্ষে ইংরাজ রাজনীতি ও রাজনৈতিকগণের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন করিয়াছিলেন।

ব্যবহার-শাস্ত্র ও রাজনীতির দিক ছাড়া আমীর আলীর চরিত্রের আর একটি বিশিষ্ট দিক আছে, তাহা তাঁহার সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চ্চা। মুসলমান সাহিত্যে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু তিনি উক্ত সাহিত্যে মাতৃভাষার গৌরব-বর্দ্ধক কিছুই করিয়া যান নাই। তাঁহার অমর কীর্ত্তি, "দি স্পিরিট অব ইসলাম" ও "দি হিষ্ট্রী অব দি সারাসেনশ" নামক গ্রন্থদ্বয়। ঐ দুই গ্রন্থ ভাবে ও ভাষায় ইংরাজী সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান পাইয়াছে। ঐ দুই গ্রন্থ লিখিয়া তিনি সমগ্র মুসলমান জগতের যে মহদুপকার করিয়াছেন, গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে কোন মুসলমানই তাহা করেন নাই। "স্পিরিট অব ইসলামে" আমীর আলী সমগ্র সংশয়াবিষ্ট জগতের সম্মুখে ইসলামের গৌরব-মহিমাকে সরল, সবল ও সুন্দর ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং শিক্ষিত য়ুরোপের বহু ভ্রান্ত ধারণার সংস্কার ও সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

"দি হিষ্ট্রী অব দি সারাসেনশ" নামক গ্রন্থে তিনি য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণের স্বেচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া এই অপূর্ব্ব জাতির উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতির একটা ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়াছেন। সারাসেন সভ্যতার দান একদিন য়ুরোপ নত মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিল এবং গ্রহণ করিয়া লাভবান্ হইয়াছিল—এই সত্য, বহু তথ্য ও বহু যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা আমীর আলী সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই দুই

গ্রন্থে তাঁহার নাম জগতের সুধীগণের নিকট সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে। ১৯২৮ অব্দের আগষ্ট মাসে গৌরবময় জীবনের শান্ত পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে।

প্রশ্ন

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ বল ও পদ পরিচয় দাও।

পারিপার্শ্বিকতা, পারদর্শিতা, মনীষী, মনস্বী, ব্যবহারবিদ্‌গণের, সাম্প্রদায়িক, প্রতিবন্ধক।

২। হিতচিন্তা ও হিতানুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য কি ?

৩। দানের ক্ষমতা যাঁহাদের অসীম স্থানের প্রতিবন্ধক তাঁহাদের নাই—এই উক্তির যাথার্থ্য আমীর আলীর কার্য্যের দ্বারা সপ্রমাণ কর।

হীরক

প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয় ঃ—ভারতের হীরক ব্যবহারের কাল (প্রাচীনতা)—হীরকের উৎপত্তি, বিস্তৃতি,প্রকৃতি, মহার্ঘতা ও প্রাপ্তিস্থান—হীরক সম্বন্ধে কয়েকটী কাহিনী।

উজ্জ্বল লাবণ্যের জন্য হীরক সকল মণিরত্নের মধ্যে প্রধান এবং দুর্লভতার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ম্মূল্য। হীরক কত দুর্লভ ও কত দুর্ম্মূল্য নিম্নলিখিত বিবরণে তাহার কথঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়।

জগতে যত হীরা আছে তৎসমস্ত একত্র সংগৃহীত হইলে তাহাদের মোট ওজন আন্দাজ ১০॥ টন্ অর্থাৎ প্রায় ২৮৪ মণের

অধিক হইবে না। কিন্তু এই পরিমাণ হীরার মূল্য ১৪০০ কোটী টাকারও অধিক। সাধারণ বাজার দর হিসাবে এই পরিমাণ সুবর্ণের মূল্য দুই কোটী টাকারও কম। আবার হীরকের সজাতি পাথুরিয়া কয়লা ৬০।৬৫ টাকাতেই ঐ পরিমাণ পাওয়া যায়। একই বংশজাত গুণবান ও নির্গুণ পুত্রের মূল্যের এই তারতম্য মানব সমাজেও আমরা প্রত্যক্ষ করি।

ভূতত্ত্ববিদ্গণ বলেন পুরাতন অরণ্যের গাছের গুঁড়ি বহু সহস্র বৎসর মাটীর তলে চাপা পড়িয়া চাপে ও তাপে পাথুরিয়া কয়লা হইয়া যায়। চাপ ও তাপ আরও বেশী হইলে কয়লা হীরকে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই ঘটনা অতি অল্পই ঘটে, তাই হীরা অতি দুর্লভ।

স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহাদি ধাতু সকল ও প্রবালাদি মণি অন্য নানা পদার্থের সহিত তাল পাকাইয়া থাকে, কিন্তু হীরা খনির মধ্যে স্বতন্ত্র স্ফটিক আকারে পাওয়া যায়। এই স্ফটিক নানা আকারে দেখা যায়। কোনটী ছয়কোণ, কোনটী আটকোণ, কোনটী বারকোণ প্রভৃতি। এই সকল খনিজ হীরা পলকাটা এবং পালিশ করা হইলে বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়।

আকরজ হীরা খুব কমই স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হয়। কিছু না কিছু রংয়ের আমেজ উহাতে থাকেই থাকে। সার্ উইলিয়াম্ ক্রুকস্ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হীরার রং বদল করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে ধবন-পরিকর্ম্ম (পালিশ) ও অস্ত্রীকরণ (পলকাটা) দ্বারা হীরকের গুণান্তর ঘটান হইত।

প্রাচীন ভারতে সাদা, লাল, হলদে, কাল্‌চে ছায়াযুক্ত হীরকও পাওয়া যাইত।

রংয়ের স্বচ্ছতা, উজ্জ্বলতা, কাটার নিপুণতা ও বেদাগ অবস্থার তারতম্যে হীরার দাম বেশী কম হয়। যে আকরজ আকাটা হীরাখণ্ড ২০০৲ টাকায় পাওয়া যায়, পলকাটা ও পালিশ করার জন্য অর্দ্ধেক অপেক্ষাও ছোট হইয়া গেলেও সেই হীরকখণ্ডের দাম ৫০০৲ টাকা হইবে। যে পরিমাণ হল্‌দে আভার হীরার মূল্য ৪০০৲ টাকা সেই পরিমাণ নীলাভ শ্বেতস্বচ্ছ হীরার দাম ৬০০০৲ টাকা স্বচ্ছন্দেই হইতে পারে।

অনেক রঙীন হীরা অন্ধকারে জ্বলে। বৈজ্ঞানিক ক্রুক্‌স্‌ প্রমাণ করিয়াছেন যে ইহাদের দিনের আলো হইতে রৌদ্রতাপ অথবা বিদ্যুৎতাপ শোষণ করিবার ক্ষমতা আছে। অন্ধকারে রাখিলে সেই শোষিত তাপ ইহারা বিকিরণ করে।

হীরা সকল পদার্থ অপেক্ষা কঠিন। এইজন্য সংস্কৃত সাহিত্যে হীরার এক নাম বজ্র। হীরা ভিন্ন হীরা কাটা যায় না। হীরার গুঁড়া তৈলে মিশাইয়া ধাতুর থলের উপর খুব দ্রুত ও জোরে ঘষিয়া পালিশ করা হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে হীরা ও কয়লা এক জাতীয়। হীরা খুব বেশী তাপে পোড়ান যায়। হীরার মধ্যে কি কি উপাদান আছে বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহা নির্ণীত হইবার পর, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নকল হীরা উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে।

শরীরাভ্যন্তরে হীরার কার্য্য বড় ভয়ানক। হীরাচূর্ণ উদরস্থ হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। মুসলমান বাদসাহদিগের সময়

সম্ভ্রান্তবংশীয় নরনারীগণ প্রয়োজন হইলে হীরকচূর্ণ অথবা অঙ্গুরীস্থ হীরকখণ্ড গলাধঃকরণ করিয়া লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতেন।

পূর্ব্বে পৃথিবীর যাবতীয় হীরা একমাত্র ভারতের খনি হইতে সংগৃহীত হইত। কৃষ্ণানদীর তীরবর্ত্তী গোলকুণ্ডা ও মধ্যভারতের অন্তর্ভূত পান্নার হীরক-খনি জগৎপ্রসিদ্ধ। বহুকালের আহরণে ভারতীয় খনিগুলি প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। বিখ্যাত ভারত-পর্য্যটক ট্রাভার্ণিয়েরে ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে ভারতীয় হীরক সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন ভারতের এক একটা হীরার খনিতে ৬০০০০ লোক কাজ করিত। গত শতাব্দীতে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলদেশে ও দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল রাজ্যের অন্তর্গত কিম্বার্লি প্রদেশে বহু হীরক খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ট্রান্সভালের খনিগুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রধানতঃ এই হীরক খনিগুলির স্বত্ব লইয়াই গত শতাব্দীর শেষ ও বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজ ও ট্রান্সভালের বুয়রগণের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে ও সমস্ত ট্রান্সভাল রাজ্য ইংলণ্ডেশ্বরের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। এখনকার শতকরা ৯৮ ভাগ হীরা কিম্বার্লি ও ব্রেজিলের খনি হইতে সংগৃহীত হয় এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যেই তাহার বার আনা বিক্রীত হয়। ইহা হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ধনশালিতার পরিমাণ অনুমিত হইতে পারে।

দুই হাজার বৎসরের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোনও দেশে হীরার ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। যদিও মিশর দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত প্লীনি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তাঁহার

গ্রন্থে ভারতীয় হীরকের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু প্রাচীন মিসর, ব্যাবিলন প্রভৃতি খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের সুসভ্য ও উন্নত রাজ্য-সমূহে হীরক ব্যবহারের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ভারতে গ্রীক ও মুসলমান অভিযানের ফলে ভারতীয় হীরক পাশ্চাত্য দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতে হীরকের ব্যবহার মহাভারতের যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে।

তুচ্ছ অঙ্গারকুলে জন্ম হইলেও হীরক ঐশ্বর্য্যোন্মত্ত রাজগণের ও বিলাসপরায়ণ ধনীদিগের এত লোভের সামগ্রী যে ইহার জন্য কত লক্ষ লক্ষ হস্ত নররক্তে কলুষিত, কত লক্ষ প্রাণ ধূলায় লুণ্ঠিত ও কত দেশ, কত রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা ভাবিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

বেশী দিনের কথা নয়, মহম্মদশাহ বাদসাহের রাজত্বকালে ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে পারস্যাধিপতি নাদির শাহ মোগল সম্রাট অধিকৃত "কোহিনুর" নামক জগৎপ্রসিদ্ধ হীরার লোভে দিল্লী আক্রমণ করেন। নাদিরশাহের দিল্লীর লুণ্ঠন ব্যাপার তোমরা ইতিহাস পাঠে সকলেই অবগত আছ। কথিত আছে নাদির এই রত্নের প্রভায় মুগ্ধ হইয়া ইহার নাম রাখেন কোহ্-ই-নুর—অর্থাৎ প্রভাপর্ব্বত। সেই হইতে এই হীরা ঐ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। নাদির শাহের মৃত্যুর পর বর্ত্তমান আফগান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নাদিরের সেনাপতি আমেদ সাহ দুরানী এই রত্ন অধিকার করেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহ আফগানগণকে পরাজিত করিয়া ইহাকে পুনরায় ভারতে আনয়ন করেন। রণজিৎকে এই হীরার দাম জিজ্ঞাসা করায়—তিনি বলিয়াছিলেন,

"পাঁচ জুতি"; অর্থাৎ যে কাড়িয়া লইতে পারিবে ইহা তাহারই। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে শিখ যুদ্ধের অবসানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ইহা অধিকার করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উপহার দেন। সেই অবধি ইহা ইংলণ্ডেশ্বরের মুকুটমণি। ইহা কখনও এক রাজার অধীনে বেশী দিন থাকে না, এই জনশ্রুতির বশীভুত হইয়াই বোধ হয় ইহাকে কাটাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ছোট করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব ইতিহাস এইরূপ;—ইহা বহুকাল মালব রাজবংশের শিরোভূষণ ছিল। সুলতান আলাউদ্দিন খিলিজী ১৩০৪ অব্দে মালব অধিকার করিয়া ইহা লাভ করেন। ১৫২৬ অব্দে মোগল বাদসাহ হুমায়ুন ইহা জয় করিয়া লন। সম্রাট সাজাহান তাঁহার পৃথিবী বিখ্যাত তখ্‌ৎ তাউস অর্থাৎ ময়ূর-সিংহাসনের ময়ূরের চোখে ইহা বিন্যস্ত করেন। অনেকে অনুমান করেন ইহাই পুরাণোল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের কৌস্তুভ মণি।

প্রশ্ন

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ বল।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ, স্ফটিক, খনন-পরিকর্ম্ম, অস্ত্রীকরণ।

২। ভিক্টোরিয়া, ট্রাভার্ণিয়ে, নাদির শাহ ও কোহিনুর সম্বন্ধে কি জান বল।

লোভ

প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য ও বর্ণনীয় বিষয় ঃ—ভোগবাসনা চরিতার্থ করিয়া কখনও বাসনার নিবৃত্তি হয় না—নিবৃত্তি হয় সংযমের দ্বারা। লোভশূন্য হইয়া ভোগ করিলে তবে শান্তি নতুবা শান্তির আশা নাই।

পৃথিবীতে আমরা কতকগুলি কল্পিত অভাব সৃষ্টি করিয়া লোভের আয়তন এত বৃদ্ধি করিয়াছি। একবার স্থিরভাবে যদি চিন্তা করি আমার কি না হইলে চলে না—আমার কি কি বিষয়ে বাস্তবিকই প্রয়োজন আছে—তাহা হইলেই দেখিতে পাই আমাদের কত অল্প বিষয়ের প্রকৃত প্রয়োজন। চারিদিকে লোভের জাল আমরা যেরূপ ভাবে ফাঁদিয়া বসি তাহাতে আমাদিগের প্রকৃত অভাব কত কম একবার মনে করিলে অবাক্ হইতে হয়। তোমার কি ভাই চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্য না হইলে চলে না ? ঐ যে কৃষক, সে ত তোমা অপেক্ষা বলশালী কম নহে ; বনজাত শাক প্রভৃতির দ্বারাই ত তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। তোমার কি ভাই দুগ্ধফেননিভ শয্যা ও নেটের মশারি না হইলে নিদ্রা হয় না ? ঐ যে ফকির, তোমা অপেক্ষা উহার হৃদয়ে শান্তি ত অধিক দেখিতে পাই, ঐ ব্যক্তি ত বৃক্ষমূলে মৃত্তিকা শয্যায় তোমা অপেক্ষা সহস্র গুণ সুখে নিদ্রা যাইতেছে। তোমার দ্বিতল ত্রিতল গৃহ না হইলে উপযুক্ত বাসস্থান হয় না ; কত গৃহস্থ যে দেখিলাম, যাঁহাদিগের চরণধূলি গ্রহণ করিবার তুমি যোগ্য নও, তাঁহারা সামান্য পর্ণ কুটীরে স্বর্গের হাসিতে কুটীর আলোকিত করিয়া পরমানন্দে বাস

করিতেছেন। হয়ত বলিবে, 'আমি বড় লোক, আমার অভ্যাস এই, আমি কি প্রকারে এ অভ্যাস ছাড়িব ?'

তোমার ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতি বধ না করিলে আহারের ব্যবস্থা হয় না। তোমার কি বনজাত শাক, ফলমূল নিরামিষ আহার করিয়া উদর পূর্ণ হয় না ? তাহা অবশ্যই হয়। তবে কিনা তুমি কতকগুলি কল্পিত অভাব স্থষ্টি করিয়া ইহা না হইলে হইবে না, উহা না হইলে হইবে না, এরূপ চীৎকার করিতেছ। মাত্র বিলাসলিপ্সাটি ত্যাগ করিয়া অনায়াসলভ্য স্বাস্থ্যজনক খাদ্য আহার, স্বাস্থ্যকর শয্যায় শয়ন, স্বাস্থ্যপূর্ণ গৃহে বসতি করিলে দেখিবে লোভ কত সঙ্কুচিত হইবে। মন, প্রাণ, শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য, কি সংসারে কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য আমাদিগের যে যে বিষয়ের প্রয়োজন তাহা অতি সামান্য, তাহা সংগ্রহ করিতে লোভ বিশেষ প্রশ্রয় পায় না।

তোমার কল্পিত অভাব তোমার সর্ব্বনাশের মূল। যে বিষয়গুলির অভাব বোধ করিয়া তুমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছ, জিজ্ঞাসা করি সেগুলিই বা তুমি ভোগ করিবে কদিন ? প্রকৃতপক্ষে এই মর্ত্ত্যভূমিতে মানুষের অভাব অতি কম এবং সেই অভাবও অধিক দিনের জন্য নহে। এই সত্যটি মনে রাখিয়া এ চাই, ও চাই, তা চাই, এরূপ কেবল চাই চাই করিও না; অতি অল্পতেই সন্তুষ্ট হইও। সকল দেশের জ্ঞানিগণ বলেন— সন্তোষামৃততৃপ্ত শান্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের যে সুখ, ধনলুব্ধ ও ইহা চাই, উহা চাই বলিয়া যাহারা ইতস্ততঃ ধাবিত তাহাদিগের সে সুখ কোথায়

যদি বুঝিতাম তোমার লোভের বিষয় হস্তগত হইলেই লোভের নিবৃত্তি হইবে তাহা হইলেও না হয় লোভ চরিতার্থ করিতে উদ্যোগী হইতে বলিতাম। এ যে দেখিতে পাই—প্রত্যেকের জীবনেই দেখিতে পাই—যতই ভোগ দ্বারা লোভ দূর করিতে চাই ততই লোভাগ্নিকে ইন্ধন দেওয়া যায়। রাজা যযাতি বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া মনে করিলেন পুনরায় যৌবন আনিতে পারিলে ভোগ দ্বারা লোভের নিবৃত্তি করিতে পারিবেন। তখন তিনি তাঁহার পুত্রদিগের নিকট যৌবন প্রার্থনা করিলেন। পুরু তাঁহাকে তাহার যৌবন অর্পণ করিল। সেই যৌবন লইয়া এক দিন নয়, দুই দিন নয়, সহস্র বৎসর নানা বিষয়ে নানা প্রকারে ভোগ সুখ চরিতার্থ করিতে লাগিলেন; অবশেষে দেখিলেন এ লোভের শেষ নাই। সহস্র বৎসরান্তে পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"হে অরিন্দম পুত্র,—যখন মনে যেরূপ অভিরুচি হইয়াছে, যে সময় যেরূপ বিষয় ভোগ করা যাইতে পারে, তোমার যৌবন লইয়া সেইরূপ বিষয়ই ভোগ করিয়াছি। ভোগবাসনা চরিতার্থ করিয়া কখনও বাসনার নিবৃত্তি হয় না, বরং অগ্নি যেমন ঘৃতাহুতি পাইলে আরও প্রজ্জ্বলিত হয়, বাসনাও সেইরূপ ভোগ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীতে যত ধান্য, যব, সুবর্ণ, পশু ও ভোগের বস্তু আছে তাহা সমস্ত একত্র করিলেও মাত্র একটি ব্যক্তিরও তৃষ্ণা মিটে না; অতএব তৃষ্ণা পরিত্যাগ করিবে। আজ পূর্ণ সহস্র বৎসর বিষয়াসক্তচিত্ত হইয়া রহিয়াছি তথাপি দিন দিন এই লোভের বিষয়গুলিতে তৃষ্ণা জন্মিতেছে।" তৃষ্ণার ন্যায় এমন রোগ আর নাই। যাহার ক্রমাগত লোভের বৃদ্ধি তাহার মনে শান্তি কোথায়?

লোভশূন্য হইয়া বিষয় ভোগ করিলে তবে শান্তি, নতুবা শান্তির আশা নাই।

যাহাতে আকৃষ্ট হইবে তাহা হইতে যত দূরে থাকিতে পার, ততই ভাল। যাহা হস্তগত হয় নাই তাহা অধিকার করিতে চেষ্টা করিবে না ; আর যাহা হস্তগত হইয়াছে তাহার আকর্ষণ অনুভব করিলেই তাহা হইতে দূরে থাকিতে যত্নবান হইবে। প্রলোভনের বিষয় হইতে যত দূরে থাকিতে পারিবে ততই লোভ সংযত হইবে।

লোভের বিষয় হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে তাই বলিয়া যে সংসারে কার্য্য করিবে না তাহা নহে। সংসারে থাকিতে হইলে অনেক সময়ে কর্ত্তব্যানুরোধে এমন কার্য্য করিতে হয়, যাহার সঙ্গে সঙ্গে ধন মান কি যশের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং অন্যান্য ভোগের বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হয়। জগৎকর্ত্তার আদেশে কর্ত্তব্য করিতেই হইবে। আমি তাঁহার দাস, তাঁহার কার্য্য করিব ; যশ চাই না, মান চাই না প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন চাই না ; তবে যশ হইলে, মান হইলে, কি অতিরিক্ত ধনবান হইলে আমি কি করিব ? হে ভগবন আমি যেন স্ফীত না হই, আবদ্ধ না হই, আমার হৃদয়ে যেন কোন বিকার উপস্থিত না হয়। এইরূপ ভাব মনে রাখিয়া লোভের বিষয় সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া নিজের উন্নতি ও পরিবারের উন্নতি ও পৃথিবীর উন্নতিসাধন করিতে সযত্ন হইবে।

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ, সমাস ও সমাসবাক্য বল।
ক্ষুন্নিবৃত্তি, দুগ্ধফেননিভ, বিলাসলিপ্সা, সন্তোষামৃততৃপ্ত, বিষয়াসক্তরুচি
২। যযাতি সম্বন্ধে কি জান বল ?
৩। প্রকৃত অভাব ও কল্পিত অভাবের মধ্যে ভেদ নির্ণয় কর।

ক্রোধ

প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য ও বর্ণনীয় বিষয় :—১। ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু—ক্রোধে চরিত্র, কর্ম্মশক্তি ও স্বাস্থ্য হীনতা প্রাপ্ত হয়। ২। কিরূপে ক্রোধ দমন করা যায় তাহার উপায় বর্ণন।

ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে। যে লোমহর্ষণ কাণ্ডগুলি পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে তাহার মূলে প্রধানতঃ ক্রোধ। ক্রোধ যে মনুষ্যকে পশুভাবাপন্ন করে তাহা একবার ক্রোধের সময় ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টি করিলেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তির মুখখানি তোমার নিকট বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হয়, যাহার মুখখানি সর্ব্বদা হাসিমাখা, যে মুখখানি তুমি দেবভাবে পরিপূর্ণ মনে কর, দেখিলেই তোমার প্রাণে আনন্দ ধরে না,—একবার ক্রোধের সময় সেই মুখখানির দিকে তাকাইও, দেখিবে সে স্বর্গের সুষমা আর নাই। নরকাগ্নিতে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছে, চক্ষু আরক্ত, অধর কম্পিত, নাসিকা বিস্ফারিত, ঘন ঘন ত্রস্ত শ্বাস বহিতেছে, সমস্ত মুখ কি এক কালিমার ছায়ায় ঢাকিয়া গিয়াছে, কি এক আসুরিক ভাবে পূর্ণ হইয়াছে; তখন তাহাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক তাহার নিকটে যাইতেও ইচ্ছা হয় না। সুন্দরকে মুহূর্ত্তমধ্যে কুৎসিৎ করিতে ক্রোধের ন্যায় অন্য কোনও রিপুই কৃতকার্য্য হয় না।

ক্রোধে যে সমস্ত রোগের উৎপত্তি হয় তাহা মনে করিতে

গেলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী স্বদেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—অপস্মার, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, নাসিকা, হৃৎপিণ্ড কি পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব, রক্তবমন প্রভৃতি রোগকে অনেক সময় ক্রোধের অনুচর হইতে দেখা যায়। কখন কখন ক্রোধের উত্তেজনায় মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। ক্ষিপ্তকারাগারের বিবরণীতে জানা যায় ক্রোধ উন্মাদের এক প্রধান কারণ। ক্রোধের উচ্ছ্বাসের পরে যে আহার করিতে ইচ্ছা হয় না, ক্ষুধা কমিয়া যায়, ইহা বোধ হয় অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। ক্রোধের ফলে পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়। ক্রোধের আবেগের সময় রক্ত যেরূপ দ্রুতবেগে শরীরের নানা স্থানে সঞ্চালিত হয় তাহা বিশেষ অপকারী।

দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে কৌরবগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাইলে ধর্ম্মরাজ ক্রোধের ভীষণ কুফল আলোচনা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সকলেরই বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বলিলেন—

"ক্রোধ সম পাপ আর, না আছে সংসারে।
কহিতেছি শুন, ক্রোধ যত পাপ ধরে॥
লঘুগুরু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধ কালে।
অকথ্য কথন লোকে ক্রোধ হ'লে বলে॥
থাকুক অন্যের কথা আত্ম হয় বৈরী।
বিষ খায়, ডুবে, মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি॥
এ কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
অক্রোধী যে জন তারে সর্ব্বলোকে পূজে॥

ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয়, ক্রোধে অপচয়॥
হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে।
ইহলোক পরলোক অবহেলে তরে॥
দেখাইবে সময়েতে তেজ সমুচিত।
ক্রোধ মহাপাপ না করিবে কদাচিৎ॥
এ কারণে বৎসগণ ত্যজ ক্রোধমন।
অশ্বমেধ ফল লভে অক্রোধ যে জন" ॥

অতএব সকলেরই ক্রোধ পরিহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। ক্রোধ দমন করিবার জন্য—

(১) ক্রোধের কুফল এবং ক্রোধজয়ের মহত্ত্ব পুনঃ পুনঃ মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে—"আমি কখন ক্রোধের বশবর্ত্তী হইব না", এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা কর্ত্তব্য।

(২) যে ব্যক্তি বা যে বিষয় ক্রোধাদ্রেকের কারণ হয় ক্রোধের সময় তাহার নিকট হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে। যখন মন প্রশান্ত হইবে, ক্রোধ পরাস্ত হইয়া যাইবে তাহার পরে আর সেই ব্যক্তি বা সেই বিষয়ের নিকটে যাইতে কোন বাধা থাকিবে না।

(৩) ক্রোধ দমন করিতে হইলে প্রথমে যাহাতে ক্রোধ স্থায়ী না হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ক্রোধ স্থায়ী হইতে না পারিলে ক্রমে কমিয়া যায়। বাইবেলে একটী অতি সুন্দর উপদেশ আছে—লেট্ নট্ দি সান্ গো ডাউন্ আপ্‌ওন ইওর রথ্—তোমার ক্রোধ থাকিতে সূর্য্যকে অস্ত যাইতে দিও না।

(৪) যাহার প্রতি ক্রোধ হইয়াছে ক্রোধের অবসান হওয়ামাত্র

অমনি তাহার নিকটে আত্মদোষ স্বীকার করিলে, কি তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে এমনি আপনার প্রতি ধিক্কার আসে যে আর ক্রোধ করিতে ইচ্ছা হয় না।

(৫) ক্রোধের সময় দর্পণ সম্মুখে থাকিলে আপনার সেই সময়ের আসুরিক মূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়ে আঘাত লাগে এবং তদ্দারা ক্রোধের নিবৃত্তি হইতে পারে।

(৬) নিজের দোষ স্মারক কোন কথা লিখিয়া সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিলে তদ্দারা উপকার হয়। শুনিয়াছি আমাদের এই বঙ্গদেশে কোন জেলার এক প্রধান উকীল অত্যন্ত ক্রোধপরবশ ছিলেন। একদিন একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে অনেক কটূক্তি করিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হন। এবং এই অনুতাপের সময় আপনার গৃহের ভিতরে চারিদিকে কয়েকখণ্ড কাগজে "আবার" এই কথাটী লিখিয়া রাখেন। ইহার পর যখনই ক্রোধের উদয় হইত, যেমনই সেই 'আবার' কথাটীর দিকে দৃষ্টি পড়িত অমনি লজ্জায় অবনত থাকিতেন।

(৭) ক্রোধের সময় চুপ করিয়া থাকা ক্রোধ দমনের আর একটী উপায়। প্লেটো এই উপায় অবলম্বন করিয়া ক্রোধ দমন করিতেন। তাঁহার ক্রোধের উদ্রেক হইলে তিনি নীরব হইয়া থাকিতেন, পরে ক্রোধ তিরোহিত হইলে যাহার প্রতি যেরূপ শাস্তি বিধান করা কর্ত্তব্য করিতেন। কোন ব্যক্তিকে কোনরূপ শাস্তি দিতে হইলে ক্রোধের সময় শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; সে সময় কিছু করিতে গেলেই মাত্রা স্থির থাকিবে না। ক্রোধের আবেগ কমিয়া গেলে প্রশান্ত হৃদয়ে দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য।

(৮) উপেক্ষা ক্রোধের ভয়ানক শত্রু। যিনি উপেক্ষা সাধন

করিয়াছেন তাঁহার প্রাণে ক্রোধের তরঙ্গ উত্থিত হইতে পারে না। অমুক ব্যক্তি আমাকে নিন্দা করিয়াছে তাহাতে আমার কি হইয়াছে? যে অন্যায় করিয়াছে সেই তাহার ফলভোগী হইবে। অমুক ব্যক্তি অন্যায় করিয়াছে বলিয়া আমিও কি অন্যায় করিব? আমি ভগবদ্বিধি অনুসারে নিস্তরঙ্গ হৃদয়ে যাহা করা কর্ত্তব্য তাহা করিব। এইরূপ চিন্তা করিলে মনস্থির হইয়া যায়। সুতরাং ক্রোধ পলায়ন করে।

(৯) কাম, লোভ, অহঙ্কার এবং পরদোষের আলোচনা যত কমাইতে পারিবে ততই ক্রোধ কমিয়া যাইবে। কাম, লোভ কি অভিমানে আঘাত পড়িলে এবং পরদোষ দর্শন বা কীর্ত্তন করিলে ক্রোধের উদয় হয়।

যাহা বলা হইল ইহা দ্বারা কেহ মনে করিও না—তবে অন্যায়ের, কি অসত্যের, কি অপবিত্রতার, কেহ প্রতিবাদ করিবে না? প্রতিকার না করিতে পারিলেও প্রতিবাদ করিতে হইবে। যেখানে অন্যায় কি অসত্য কি অপবিত্রতার লেশ মাত্র দেখিতে পাইবে সেইখানে তার স্বরে তাহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিবে; যাহাতে তাহা বিলুপ্ত হয় তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। সাবধান এইটুকু, যেন কোন প্রকারে আপনার মনে বিকারের উদয় না হয়। কর্ত্তব্যানুরোধে ভগবদ্বিধির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অসত্য, অন্যায় ও অপবিত্রতার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে কিন্তু মনের ভিতরে ক্রোধের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। যে ব্যক্তি পাপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হয়—সে ভগবানের নিকট বিশ্বাসঘাতক।

(১০) ক্রোধ দমনের নিমিত্ত কতকগুলি শারীরিক নিয়ম পালন কর্ত্তব্য। যে পদার্থগুলি আহার করিলে ক্রোধের পুষ্টি হয় তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা বিধেয়। যাঁহারা ক্রোধন-স্বভাব তাঁহারা যাহাতে শরীর শীতল রাখিতে পারেন তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। প্রতিদিন কয়েক বার পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত, হাতের কনুই পর্য্যন্ত, কাণের পার্শ্বে ও ঘাড়ে জল দিলে স্বভাবের উগ্রতা ক্রমে কমিয়া যায়। মুসলমানগণ নামাজের পূর্ব্বে যে এইরূপে অজু করিয়া থাকেন, বোধ হয় মনকে প্রশান্ত করাই উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে কোন কোন সময়ে ক্রোধ প্রদর্শন প্রয়োজন হইতে পারে। সাধুগণ যে ক্রোধের ভাব প্রদর্শন করেন তাহা ক্রোধ নহে, বাহিরে অন্যায়ের শাসন জন্য ক্রোধের ভাণ মাত্র। তদ্দারা তাঁহাদিগের মনে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় না।

প্রশ্ন

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ বল ও পদ পরিচয় দাও।

লোমহর্ষণ, প্রতীয়মান, অপস্মার, উচ্ছ্বাস, প্রণিধানযোগ্য, বিশ্বাসঘাতক।

২। কিরূপে ক্রোধ দমন করা যায় তার উপায়গুলি সংক্ষেপে বল।

৩। যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ-সংযম ও সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে কি জান বল।

দাদাভাই নৌরোজী

প্রবন্ধের বর্ণনীয় ও প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ—দাদাভাই নৌরোজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী। এই জীবনীর শিক্ষণীয় বিষয় এই, যে বর্ত্তমানকালেও একমাত্র সুশিক্ষা ও সাধনাবলে দরিদ্রবংশে জন্মিয়াও জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া যশস্বী ও বরণীয় হওয়া যায়।

এই পুস্তকে একলব্যের উপাখ্যানে তোমরা দেখিয়াছ যে, পরের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়াও একমাত্র একাগ্রতা ও অধ্যবসায় বলে হীন-বংশজ নিষাদপুত্র একলব্য ধনুর্বিদ্যায় জগতের শ্রেষ্ঠ রথী, কুরুক্ষেত্রসমরবিজয়ী, বীর অর্জ্জুনকেও অতিক্রম করিয়াছিল। মহাত্মা দাদাভাই নৌরোজীর জীবনী পাঠে তোমরা শিখিতে পারিবে যে বর্ত্তমানকালেও একমাত্র সুশিক্ষা ও সাধনাবলে দরিদ্র বংশে জন্মিয়াও জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া যশস্বী ও বরণীয় হওয়া যায়।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা সেপ্টেম্বর, বোম্বাই নগরে দরিদ্র পার্শী-পুরোহিত-বংশে দাদাভাই নৌরোজী জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে চারি বৎসর বয়সে দাদাভাই পিতৃহীন হন। বর্ত্তমানকালের পার্শী মহিলাদিগের ন্যায় শিক্ষিতা না হইলেও তাঁহার জননী প্রখর-বুদ্ধি-শালিনা, সত্যপরায়ণা, পবিত্রস্বভাবা রমণী ছিলেন। পার্শী সমাজে বিধবাদিগের পত্যন্তর গ্রহণ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও দাদাভাইয়ের জননী পতিব্রতা হিন্দু বিধবার ন্যায় পরলোকগত স্বামীর চরণ ধ্যান করিয়া স্বেচ্ছায় আজীবন বৈধব্যক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন এবং

তাঁহার প্রিয়তম "দাদীকে" স্নেহের আচ্ছাদনে আবৃত রাখিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসামান্য যত্নে তাঁহার শিক্ষা, সুখ ও উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেন। তাঁহার আত্মচরিতে দাদাভাই লিখিয়াছেন, "আমি যা কিছু করিয়াছি তাহার মূল আমার মাতা।"



বোম্বাই নগরের এক দাতব্য বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পিতৃহীন দরিদ্র-শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তথা হইতে বৃত্তি লাভ করিয়া বৃত্তিভোগী ছাত্ররূপে দাদাভাই এল্‌ফিন্‌ষ্টোন ইন্‌ষ্টিটিউসনে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য প্রবিষ্ট হন। অপূর্ব্ব মেধা ও অনন্য-

সাধারণ অধ্যবসায়ের ফলে তিনি শীঘ্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে পরিগণিত হন। ছাত্রাবস্থায় বিদ্যালয়ের অধিকাংশ পুরস্কার ও বৃত্তি দাদাভাই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা সমাপ্তির পর বোম্বাই শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি তৎকালীন প্রধান বিচারপতি, স্যর আরস্কিন পেরী যুবক নৌরজীর বিদ্যা, বুদ্ধি ও সচ্চরিত্রতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ইংলণ্ড গমনের প্রস্তাব করেন এবং ইংলণ্ড প্রবাসের অর্দ্ধেক ব্যয় স্বয়ং বহন করিতে স্বীকৃত হন। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণের প্ররোচনায় তরুণবয়স্ক দাদাভাই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন এই আশঙ্কায় সেই প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। অতঃপর তিনি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্কুলের অন্যতম শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজের গণিত ও বিজ্ঞানের য়ুরোপীয় অধ্যাপকের মৃত্যু ঘটিলে দাদাভাই তাঁহার পদে নিযুক্ত হন ও 'প্রোফেসর দাদাভাই' বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত হন। তিনিই এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজের সর্ব্বপ্রথম দেশীয় অধ্যাপক।

১৮৪৫ হইতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সভা সংস্থাপন, জ্ঞানপ্রচারক সমাজ প্রতিষ্ঠা, সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কার সংক্রান্ত সভা স্থাপন, বাল্যবিবাহ নিবারণ ও হিন্দু-বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন প্রভৃতি বহুবিধ সদনুষ্ঠানের অগ্রণী বা প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের বিখ্যাত বণিক, মেসার্স কামা এণ্ড কোং ইংলণ্ডে তাঁহাদের ব্যবসায় বিস্তারের জন্য দাদাভাইকে তাঁহাদের কারবারের অংশী করিয়া প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। গণিত ও বিজ্ঞানের নবীন অধ্যাপক, ৩০ বৎসর বয়স্ক

যুবক দাদাভাইয়ের ব্যবসা সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলেও তাঁহার প্রখর বুদ্ধি, অপূর্ব্ব অধ্যবসায়, প্রশংসনীয় চরিত্র ও অসাধারণ কর্ম্মপটুতা কোম্পানীর স্বত্বাধিকারীগণকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ১৮৬২ অব্দে মেসার্স কামা এণ্ড কোম্পানীর সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিয়া দাদাভাই কয়েক বৎসর স্বাধীনভাবে ব্যবসা করেন।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি তত্রত্য অনেক সাহিত্য ও বিজ্ঞান-সভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং লণ্ডন য়ুনিভার্সিটী কলেজে গুজরাটীর অধ্যাপক ও উহার সেনেটের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের অবস্থা যথাযথরূপে ইংলণ্ডবাসীদিগকে জ্ঞাত করাইবার জন্য তিনি প্রবাসী ভারতবাসীদিগকে লইয়া "লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি" ও ভারতহিতৈষী ইংরাজগণকে লইয়া "ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন" নামক দুইটী সভা স্থাপন ও তথায় ভারতকথা আলোচনা আরম্ভ করেন। এই বিষয়ে পরলোকগত ব্যারিষ্টার বিখ্যাত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডব্লু, সি, ব্যানার্জ্জী) তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৮৬৯ অব্দে দাদাভাই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। বোম্বাই নগরবাসী ও স্যার পিরোজ সা মেটা প্রমুখ নেতৃবর্গ তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতির জন্য স্বদেশে ও বিদেশে অবিশ্রান্ত চেষ্টার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁহাকে এক প্রকাশ্য সভায় অভিনন্দিত করেন ও ত্রিংশ সহস্র মুদ্রাপূর্ণ একটী থলি উপহার দেন। বলা বাহুল্য এই মুদ্রা সমস্তই দাদাভাই দেশের কার্য্যে ব্যয় করেন, ইহার একটি কপর্দ্দকও নিজের জন্য গ্রহণ করেন নাই। পর বৎসর আবার ইংলণ্ডে গমন করিয়া দাদাভাই ভারতের দারিদ্র্য, ভারতের

বাণিজ্য, ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা, উচ্চ রাজকার্য্যে ভারতবাসীকে নিয়োগ, প্রভৃতি বিষয়ে অক্লান্তভাবে আলোচনা করিয়া পার্লামেণ্ট মহাসভার দৃষ্টি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট করেন।

১৮৭৪ অব্দে রাজ্যশাসন বিষয়ে রেসিডেণ্ট ও রাজার মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় বরোদারাজ গায়কবাড় মলহর রাও দাদাভাইকে প্রায় লক্ষ টাকা বার্ষিক বেতনে তাঁহার রাজ্যের দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। এক বৎসর অতীব সুখ্যাতি ও সফলতার সহিত এই কার্য্য করিয়া দাদাভাই পুনরায় দেশের ও দশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৭৫ অব্দে তিনি বোম্বাই কর্পোরেশন ও টাউন কৌন্সিলের সদস্য হন ও পর বৎসর 'পভার্টি অব ইণ্ডিয়া' নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বিলাতে প্রচার করেন।

ইহার কিছুকাল পরে দাদাভাই গবর্ণমেণ্ট হইতে "জষ্টিস অব দি পীসের" সম্মান প্রাপ্ত ও বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ অব্দে বোম্বাই নগরে কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে দাদাভাই অক্লান্ত পরিশ্রমে বোম্বাইয়ের প্রথম অধিবেশনকে সফলতামণ্ডিত করেন। পর বৎসর কলিকাতায় জাতীয় মহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনিই সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি আরও দুইবার জাতীয় মহাসভায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন—১৮৯২ অব্দে লাহোরে এবং ১৯০৬ অব্দে ৮১ বৎসর বয়সে কলিকাতায়। ভারতগৌরব সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত আর কোন ভারতবাসী একবারের অধিক এই মহাসভার সভাপতিত্বে মনোনীত হন নাই।

ইতঃপূর্ব্বে বঙ্গগৌরব বিখ্যাত বাগ্মী লালমোহন ঘোষ পার্লামেণ্ট মহাসভার সদস্য হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া নিরস্ত হন। বৃদ্ধ দাদাভাই ১৮৮৬ অব্দে বিফলমনোরথ হইয়াও কিন্তু ভগ্নোদ্যম হন নাই ; ক্রমাগত পাঁচ বৎসর চেষ্টা করিয়া ১৮৯২ অব্দে ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি পার্লামেণ্ট মহাসভার সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার সাফল্য ভারতবাসীর প্রাণে এক নূতন আশার সঞ্চার করে। পর বৎসর একমাত্র পুত্র বিয়োগে শোক-কাতর দাদাভাই কিছুদিনের জন্য ভারতে আগমন করেন। তখন পার্লিয়ামেণ্টের প্রথম ভারতীয় সভ্যকে যেরূপ অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। স্যার উইলিয়াম হাণ্টার লিখিয়াছেন যে, একজন ব্যতীত কোন বড়লাটও সেরূপে অভিনন্দিত হন নাই। এই বৎসরেই ভারতেশ্বরী মহারাণী ভারতের ব্যয়সঙ্কোচ জন্য নিযুক্ত 'ওয়েলবি' কমিশনে তাঁহাকে সদস্য নিযুক্ত করেন।

স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ও বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতার জন্য দাদাভাই শেষ কয়েক বৎসর রাজনীতিক আন্দোলনাদিতে যোগ দান করিতে পারিতেন না বটে কিন্তু সমাগত দেশনায়কগণকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন। এই নিঃস্বার্থ স্বদেশ-প্রেমিকের নিষ্কলঙ্ক কর্ম্মময় জীবন রাণাডে, ওয়াচা, গোখলে, পরাঞ্জপের মত অকৃত্রিম স্বদেশ-সেবকের সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার জীবনব্যাপী চেষ্টার ফলে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারসমাচ্ছন্ন দেশে শিক্ষাবিস্তার ও অনেক সমাজ-সংস্কার সাধিত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন জাতি রাজনীতিক ক্ষেত্রে একতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া স্বদেশের উন্নতি সাধনে চেষ্টা পাইতেছে। ভারত শাসন-পরিষদে ভারতবাসী দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের

ভার প্রাপ্ত হইয়া তাহা সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করিতেছে। ভারতের রাজকার্য্যে ভারতবাসী সর্ব্বোচ্চ পদও লাভ করিয়াছে। দেশবাসীগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগরিত ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। বাস্তবিক দাদাভাইয়ের ন্যায় জীবন-যাপনেই জীবনের সার্থকতা। ন্যায়পরায়ণ বৃটিশ জাতির শাসনাধীনে থাকিয়া আমাদের দেশ যে ভবিষ্যতে প্রভূত উন্নতি লাভ করিবে ইহাই তাঁহার অন্তরের বিশ্বাস ছিল এবং এই উন্নতি যে দেশবাসীর কর্ত্তব্যপালনে নিষ্ঠার উপর নির্ভর করিতেছে, ইহাও তিনি বরাবর বলিয়া গিয়াছেন।

দেশবাসী তাঁহার বিরাট মহত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন, "দি গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান অব ইণ্ডিয়া"। আসমুদ্র-হিমাচল এই নাম স্বদেশপ্রেমের একটী জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিত। দেশবাসীর অকৃত্রিম প্রীতি এবং শ্রদ্ধার পরিচায়ক এই নামটিতে তিনি আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিতেন।

১৯১৮ অব্দের ৩০শে জুন ৯২ বৎসর বয়সে অদ্বিতীয় দেশাচার্য্য দাদাভাই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত অমর-ধামে গমন করিয়াছেন।

প্রশ্ন

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ বল ও পদ পরিচয় দাও।

প্রখরবুদ্ধিশালিনী, শিক্ষাপবিষদের, নিরপেক্ষ, অনন্য-সাধারণ, পরলোকগত, অভিনন্দিত, ভারতশাসন-পরিষদে দেশাত্মবোধ, আসমুদ্র-হিমাচল।

২। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কলেজ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পিরোজ সামেটা, কংগ্রেস, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, গোখলে, পরাঞ্জপে— ইহাদের সম্বন্ধে কি জান বল?

রোগীর সেবা

প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য ও বর্ণনীয় বিষয়ঃ—১। রোগীর সেবা ধর্ম্ম। ২। সেবা করিতে বসিয়া যত্নের আধিক্য দেখাইবার দোষ বর্ণন। ৩। প্রকৃত সেবকের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ।

যে বাটিতে রোগীর সেবা ভাল না হয়, সে বাটী ভাল নয়। সে বাটিতে স্নেহ মমতা কম—স্বার্থপরতা বেশী—আত্মত্যাগ শক্তি ন্যূন—বিলাসিতা অধিক। সে বাটীর স্ত্রী-পুরুষেরা সহজেই ধর্ম্ম-পথ-ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, কখন কোন উন্নত জীবনের অধিকারী হইতে পারে না।

রোগীর সেবা পরিবারবর্গের যে কতদূর করা উচিত, আমি তাহার কোন বিশেষরূপ ইয়ত্তা করিতে পারি না। এই বিষয়ে আমাদিগের সম্মিলিত পরিবারের গুণবত্তা আমার চক্ষে অপরিসীম বলিয়াই বোধ হইয়াছে। ঐ সময়ে মিলিত পরিবারবর্গের টাকা এক এবং মন এক হইয়া যায়। আমি স্বচক্ষে পীড়িতাবস্থ ইংরাজের সেবা এবং চিকিৎসা দেখিয়াছি। পীড়িত ব্যক্তির পত্নী যদি একটু রাত্রি জাগরণ করিলেন, যদি ঠিক সময়ে স্বয়ং হাজিরা না খাইলেন তবেই তাঁহার ঢি ঢি প্রশংসা হইল। পীড়িতের ভ্রাতা যদি তাঁহার বাটীতে আসিলেন এবং ভ্রাতা কেমন আছেন, পরিচারককে দিনের মধ্যে দুই চারিবার জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ডাক্তারের সঙ্গে পীড়া সম্বন্ধীয় দুই একটা কথা কহিলেন, তাহা হইলেই তিনি ভ্রাতৃকর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিলেন। প্রতিবেশী ইংরাজ

যদি বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া নিজ নামাঙ্কিত কার্ড রাখিয়া গেলেন তাহা হইলেই সামাজিক নিয়ম রক্ষার দায় হইতে খোলসা হইলেন। এই বিদেশে ত ইংরাজদিগের পীড়ার সময় বেতনভোগী খানসামা প্রভৃতি দ্বারা যতদূর সেবা হইবার তাহাই হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের স্বদেশেও পরিবারবর্গের মধ্যে কাহাকেও বড় একটা কিছু করিতে হয় না। বেতনগ্রাহিনী ধাত্রী অথবা দয়াবতী উদাসিনীগণ মুখ্যতঃ উহাদিগের রোগের সেবা করিয়া থাকে। অতএব রোগসেবা সম্বন্ধে ইংরাজের রীতি আমাদের অনুকরণীয় নহে।

এই স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখি। আস্তাবলে যদি একটা ঘোড়া পীড়িত হইয়া পড়ে তবে আস্তাবলের সকল ঘোড়া পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করে—গোশালায় একটা গরু রুগ্ন হইয়া পড়িলে আর যে গরু তাহাকে দেখিতে পায়, সেই লেজ উঁচু করিয়া দৌড়াইতে চায়। কুকুর, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া, ময়না, টিয়া, চটক প্রভৃতি সকল পশু পক্ষীরই এই ব্যবহার। প্রায় কেহই স্বজাতীয় পীড়িতের সমীপে গমন করিয়া তাহার গা ছাড়িয়া বা চাটিয়া দিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা করে না। অতএব পীড়িতের শুশ্রূষা পাশবধর্ম্মের বিপরীত কার্য্য। যে মনুষ্য জাতির মধ্যে পাশবভাব অল্প, সেই জাতীয় ব্যক্তি পীড়িতের সেবায় তত অধিক যত্নশীল হইয়া থাকে।

যদি রোগীর সেবার কোন সীমা থাকে, তবে সে সীমা বাহির হইতে নির্দ্দিষ্ট হইবার নয়। সে সীমা সেবার উদ্দেশ্য কি, ইহাই বিচার করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সেবার উদ্দেশ্য পীড়িতকে রোগ মুক্ত করা। রোগীর মনে ভয় সঞ্চার হইলে

রোগ মুক্তির চেষ্টা বিফল হইতে পারে। এইজন্য এমনভাবে সেবা করা আবশ্যক যাহাতে রোগী মনে না করিতে পারে যে তাহার জন্য পরিবারবর্গ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তুমি স্ত্রী, কি পুত্র, কি ভ্রাতা রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইয়া আছ—তোমার আহার করিবার সময় হইল, আর যে ব্যক্তি তোমার স্থান গ্রহণ করিবে সে রোগীর ঘরে আসিল, তোমাকে খাইতে যাইবার অবসর দিল—তুমি যাইতে চাহ না। ইহাতে রোগী কি ভাবিবে? তুমি তাহার পীড়ার আতিশয্যে ভীত হইয়াছ ইহাই বুঝিবে না কি? এবং তাহা বুঝিলে স্বয়ং ভীত হইবে না কি? অতএব ওরূপ করিও না। ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আহার করিতে যাও। আর তুমি মা, শিশু পীড়িত হইয়া তোমার ক্রোড়ে শায়িত—তুমি রাত্র দিন তাহার মলিন মুখমণ্ডলের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছ। খাইতে যাও না, শুইতে যাও না, একেবারে শরীর পাত করিতেছ। যদি শিশু তোমার দুধ খায়—তবে তোমার শোকবিহ্বল হৃদয়-শোণিত দূষিত হইতেছে—তোমার দুগ্ধ, যাহা উহার সর্ব্বাপেক্ষা সুপথ্য তাহা বিষবৎ হইয়া উঠিতেছে; তুমি অধীর হইয়া শিশুর ত কোন উপকার করিতে পারিতেছ না, উহাকে দূষিত স্তন্যরূপে বিষপান করাইয়া তাহার সাক্ষাৎ বধভাগিনী হইতেছ। মনে কর উটি যেন কচি নয়—তোমার ক্রন্দনের, হা হুতাশের, উপবাসের এবং অনিদ্রার প্রকৃত হেতুই বুঝিতে সমর্থ। তাহা হইলে ত ও বড়ই ভীত হইত। কিন্তু যাহাতে রোগী ভীত হইতে পারে এমন কাজ করিতে নাই। অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আপনার শরীরকে সুস্থ রাখ, শিশুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ্যটী নষ্ট করিও না। এইজন্যই

প্রাচীনা গৃহিণীরা বলিতেন, পীড়িত ছেলেকে কোলে করিয়া চক্ষের জল ফেলিতে নাই।

তবে কি রোগীর নিকট হাস্যকৌতুক বিদ্রূপাদি করিয়া দেখাইব যে, আমি তাহার পীড়ায় কিছুই ভীত হই নাই? বরং এপক্ষ অবলম্বন করা ভাল, তথাপি অধীর এবং ভয়বিহ্বল হওয়া ভাল নয়। কিন্তু এরূপ কৃত্রিম ব্যবহারেও অনেক দোষ আছে। যাহা কৃত্রিম এবং মিথ্যা তাহার সমগ্র ফল কখনই উত্তম হইতে পারে না। রোগী ঐ কৃত্রিমতার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া বিরক্ত হইবে—অথবা যদি প্রবেশ করিতে না পারে, তোমাকে নির্ম্মম ও হৃদয়শূন্য মনে করিবে—অথবা স্বয়ং হাস্যপরিহাসে যোগ দিতে গিয়া নিজের নাড়ী চঞ্চল এবং স্নায়ুমণ্ডল বিলোড়িত করিয়া তুলিবে। অতএব ওরূপ কৃত্রিমতাও দূষ্য।

রোগীর সেবক সর্ব্বদা রোগীর প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিবেন; তাহার কি কষ্ট হইতেছে তাহা বিনা কথনে এবং বিনা ইঙ্গিতেও বুঝিবেন এবং সে কষ্ট নিবারণ বা উপশমের যে উপায় আছে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রয়োগ করিবেন। কোন ব্যস্ততার লক্ষণ দেখাইবেন না—স্বয়ং ধীর, শান্তমূর্ত্তি হইয়া পীড়িতরূপ দেবতার পূজা করিতে থাকিবেন।

পীড়িতের সেবক আর দেবতার সাধকে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সাধককে স্থিরাসন হইয়া থাকিতে হয়। চুল্‌বুলে লোকেরা, যাহারা সর্ব্বদাই এপাশ ওপাশ হইয়া বসিতে থাকে, একভাবে স্থির থাকিতে পারে না, তাহারা ভাল সেবক হয় না। সাধককে নিশ্চলদৃষ্টি হইতে হয়। তাঁহার হৃদয়ে ধ্যানগম্য ইষ্টমূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণ জাগরূক

থাকেন। সেবককেও পীড়িতের পূর্ব্বমূর্ত্তি এবং পূর্ব্বভাব দৃঢ়রূপে স্মরণ রাখিতে হয়। তাহা হইলেই ব্যাধিজনিত লক্ষণবিপর্য্যয় তাঁহার লক্ষ্যমধ্যে আইসে। সাধকের পক্ষে তন্মনস্ক হওয়া অত্যাবশ্যক। সেবকেরও পীড়িতের প্রতি তন্মনস্ক হইয়া থাকিতে হয়। তাহা না থাকিলে তিনি উহার কোন্ সময়ে কি প্রয়োজন হইতেছে তাহা বুঝিতে পারেন না; রোগীকে কথা কহিয়া অথবা ইঙ্গিত করিয়া আত্ম প্রয়োজন ব্যক্ত করিতে হয় এবং রুগ্ন ব্যক্তিরা তাহা করিতে পারেও না এবং চাহেও না; যদি করিতে হয় বড়ই বিরক্ত ও দুঃখিত হয়। যে সেবক বা সেবিকাতে সাধকের এই সকল গুণ বিদ্যমান, তিনি রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেই রোগীর প্রফুল্লতা জন্মে। তিনি আসিয়াই যেন জানিতে পারেন—একটু জল চাই---কি দুই চারিটা দাড়িম্বের দানা চাই—গায়ের চাদরটা একটু পায়ের দিকে টানিয়া দিতে হইবে—বালিশটা একটু উচ্চ করিয়া দিতে হইবে, ফুলগুলি সরাইয়া একটু দূরে বা নিকটে রাখিতে হইবে—শীতল হস্তটি কপালে দিতে হইবে—ঠিক কতটুকু চাপিয়া বা আল্গা করিয়া দিতে হইবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি আস্তে আস্তে নিজে ঐ কাজগুলি করিতে থাকেন, পীড়িতের বদনমণ্ডলে মৃদুহাস্যের আভা দেখা দেয়—সেবক কৃতার্থ হন।

পরিজনগণ উল্লিখিতভাবে রোগীর সেবা করিবে। গৃহস্বামী সকলকে সতর্ক করিয়া দিবেন, যেন পীড়িতের বিছানা, বালিস, বস্ত্রাদি বাটীর অপর কাহারও বস্ত্রাদির সহিত না মিশে—তাহার মল, মূত্র, ক্লেদাদি বাটী হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কৃত হয়—তাহার ব্যবহৃত পাত্রাদি-বাটীর সাধারণ পাত্রাদি হইতে স্বতন্ত্র থাকে—এবং সেবকেরা

যতদূর পারেন যে কাপড়ে রোগীর ঘরে থাকেন, সে কাপড় না ছাড়িয়া বাটীর অপর লোকের বিশেষতঃ বালকবালিকাদিগের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে না আইসেন। গৃহস্বামী পীড়ার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া এই সকল আদেশ দিবেন এবং সমস্ত পরিজন পালন করিবে। গৃহস্বামীর আদেশ যে পরিজনেরা পালন করিবে সেকথা দৃঢ়রূপে বলিবার প্রয়োজন এই যে, স্ত্রীলোকেরা বিশেষতঃ পীড়িত ছেলের মায়েরা, এই বিষয়ে একটু ভ্রমান্ধ। তাঁহারা ছেলের মলমূত্রে ঘৃণা করা অকল্যাণকর মনে করিয়া ঐ সকল আদেশ পালনে শিথিলযত্ন হইয়া থাকেন। বাস্তবিক পীড়িতের মল মূত্রে ঘৃণা করা অকল্যাণকর বটে এবং তাহা করিতে নাই; কিন্তু এস্থলে ঘৃণা প্রদর্শন হইতেছে না, কেবলমাত্র সংস্রবদোষ নিবারণের উপায় বিধান হইতেছে। ছেলের মায়েরা যেন কখনই না ভুলেন যে, এক মাতৃগর্ভসম্ভূত সন্তানদিগের পীড়া আপনাদিগের মধ্যে বড়ই সহজে সংক্রামিত হয়, আর ডাগরদিগের পীড়া ছোটদিগকে যত ধরে ছোটর পীড়া ডাগরকে তত ধরে না। যুবা এবং প্রৌঢ়দিগের পীড়াও সংক্রামকধর্ম্মী হইয়া থাকে। বৃদ্ধের পীড়াই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সংক্রামক।

প্রশ্ন

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ বল ও পদ পরিচয় দাও।

গুণবত্তা, বিলোড়িত, তন্মনস্ক, লক্ষণবিপর্য্যয়, শিথিল-যত্ন, সংক্রামক-ধর্ম্ম।

২। পীড়িতের সেবক আর দেবতার সেবকের সাদৃশ্য বর্ণন কর।

৩। পীড়িতের সেবকের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক?

ভ্রাতৃস্নেহ

প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয় ঃ—১। ভ্রাতৃস্নেহ কত গভীর ও কত পবিত্র। ২।. এই ভ্রাতৃস্নেহ প্রধানতঃ অর্থসম্পদ-লালসা ও কুচক্রীর প্ররোচনায় হৃদয় হইতে লয় পায়।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ত্রিপুরার মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য নিয়মিত রাজকার্য্য সমাপন করিলেন। প্রাতঃকালের সূর্য্যালোক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। মেঘের ছায়ায় দিন আবার অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। মহারাজ অত্যন্ত বিমনা আছেন। অন্য দিন রাজসভায় নক্ষত্ররায় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি উপস্থিত ছিলেন না। রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তিনি ওজর করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার শরীর অসুস্থ। রাজা স্বয়ং নক্ষত্ররায়ের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নক্ষত্র মুখ তুলিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না। একখানা লিখিত কাগজ লইয়া কাজে ব্যস্ত আছেন, এমনি ভাণ করিলেন। রাজা বলিলেন—"নক্ষত্র, তোমার কি অসুখ হইয়াছে ?"

নক্ষত্র কাগজের এপিঠ ওপিঠ উল্টাইয়া হাতের অঙ্গুরী নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,"অসুখ ? না অসুখ ঠিক নয়—এই একটুখানি কাজ ছিল—হাঁ হাঁ অসুখ হ'য়েছিল—কতকটা অসুখের মত বটে।"

নক্ষত্ররায় নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন—গোবিন্দমাণিক্য অতিশয় বিষণ্ণ মুখে নক্ষত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—হায় হায়, স্নেহের নীড়ের মধ্যেও হিংসা

ঢুকিয়াছে, সে সাপের মত লুকাইতে চায়, মুখ দেখাইতে চায় না। আমাদের অরণ্যে কি হিংস্র পশু যথেষ্ট নাই, শেষে কি মানুষও মানুষকে ভয় করিবে? ভাইও ভায়ের পাশে গিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বসিতে পারিবে না? এই আমার ভাই, ইহার সঙ্গে প্রতিদিন এক গৃহে বাস করি, একমনে বসিয়া থাকি, হাসিমুখে কথা কই—এ ত আমার পাশে বসিয়া মনের মধ্যে ছুরি শানাইতেছে। গোবিন্দমাণিক্যের নিকট তখন সংসার হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যের মত বোধ হইতে লাগিল; ঘন অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারিদিকে দন্ত ও নখরের ছটা দেখিতে পাইলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহারাজ মনে করিলেন, এই স্নেহপ্রেমহীন হানাহানির রাজ্যে থাকিয়া আমার স্বজাতীয়, আমার ভাইদের মনে কেবল হিংসা, লোভ ও দ্বেষের অনল জ্বালাইতেছি; আমার সিংহাসনের চারিদিকে আমার প্রাণাধিক আত্মীয়েরা আমার দিকে চাহিয়া মনে মনে খুব চক্র করিতেছে, শৃঙ্খলবদ্ধ কুক্কুরের মত চারিদিক হইতে আমার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার অবসর খুঁজিতেছে। ইহা অপেক্ষা ইহাদের তৃষ্ণা মিটাইয়া এখান হইতে অপসৃত হওয়াই ভাল। প্রভাত-আকাশে গোবিন্দমাণিক্য যে প্রেমমুখচ্ছবি দেখিয়াছিলেন তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহারাজ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—“নক্ষত্র, আজ অপরাহ্নে গোমতী তীরের নির্জ্জন অরণ্যে আমরা দুই জনে বেড়াইতে যাইব।”

রাজার এই গম্ভীর আদেশবাণীর বিরুদ্ধে নক্ষত্রের মুখে কথা সরিল না, কিন্তু সংশয়ে ও আশঙ্কায় তাঁহার মন আকুল হইয়া

উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—মহারাজ এতক্ষণ নীরবে দুই চক্ষু তাঁহারই মনের দিকে নিবিষ্ট করিয়া বসিয়াছিলেন, সেখানে অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে যে ভাবনাগুলি কীটের মত কিলবিল করিতেছিল, সেগুলো যেন সহসা আলো দেখিয়া অস্থির হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভয়ে ভয়ে নক্ষত্ররায় রাজার মুখের দিকে একবার চাহিলেন—দেখিলেন, তাঁহার মুখে কেবল সুগভীর বিষণ্ণ শান্তির ভাব, সেখানে রোষের রেখা মাত্র নাই। মানব-হৃদয়ের কঠিন নিষ্ঠুরতা দেখিয়া কেবল সুগভীর শোক তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল।

বেলা পড়িয়া আসিল, তখনও মেঘ করিয়া আছে। নক্ষত্র রায়কে সঙ্গে লইয়া মহারাজ পদব্রজে অরণ্যের দিকে চলিলেন। এখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে কিন্তু মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা বলিয়া ভ্রম হইতেছে,—কাকেরা অরণ্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া অবিশ্রাম চীৎকার করিতেছে; কিন্তু দুই একটা চিল এখনও আকাশে সাঁতার দিতেছে। দুই ভাই যখন নির্জ্জন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন নক্ষত্ররায়ের গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। বড় বড় প্রাচীন গাছ জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে-তাহারা একটী কথা কহে না কিন্তু স্থির হইয়া যেন কীটের পদশব্দটুকু পর্য্যন্তও শোনে; তাহারা কেবল নিজের ছায়ার দিকে, তলস্থিত অন্ধকারের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকে। অরণ্যের সেই জটিল রহস্যের ভিতরে পদক্ষেপ করিতে নক্ষত্ররায়ের পা যেন আর উঠে না—চারিদিকে সুগভীর নিস্তব্ধতার ভ্রুকুটি দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ের অত্যন্ত সন্দেহ

ও ভয় জন্মিল। ভীষণ অদৃষ্টের মত নীরব রাজা এই সন্ধ্যাকালে এই পৃথিবীর অন্তরাল দিয়া তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন কিছুই ঠাহর পাইলেন না। মনে করিলেন, নিশ্চয় রাজার কাছে ধরা পড়িয়াছেন—এবং গুরুতর শাস্তি দিবার জন্য রাজা তাঁহাকে এই অরণ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। নক্ষত্ররায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে পারিলে বাঁচেন, কিন্তু মনে হইল কে যেন তাঁহার পা বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কিছুতেই তাঁহার পরিত্রাণ নাই।

অরণ্যের মধ্যস্থলে কতকটা ফাঁকা। একটি স্বাভাবিক জলাশয়ের মত আছে, বর্ষাকালে তাহা জলে পরিপূর্ণ। সেই জলাশয়ের ধারে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা বলিলেন, "দাঁড়াও!" নক্ষত্ররায় চম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল,—রাজার আদেশ শুনিয়া সেই মুহূর্ত্তে কালের স্রোত বন্ধ হইল—সেই মুহূর্ত্তেই যেন অরণ্যের বৃক্ষগুলি যে যেখানে ছিল ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল—নীচে হইতে ধরণী এবং উপর হইতে আকাশ যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কাকের কোলাহল থামিয়া গিয়াছে, বনের মধ্যে একটীও শব্দ নাই—কেবল সেই "দাঁড়াও" শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন গম্ গম্ করিতে লাগিল,—সেই "দাঁড়াও" শব্দ যেন তড়িৎ প্রবাহের মত বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, শাখা হইতে প্রশাখায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, অরণ্যের প্রত্যেক পাতাই যেন সেই শব্দের কম্পনে রী রী করিতে লাগিল। নক্ষত্ররায় যেন গাছের মতই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা তখন নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে মর্ম্মভেদী স্থির বিষণ্ণ

দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া, প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "নক্ষত্র! তুমি আমাকে মারিতে চাও?"

নক্ষত্র বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন—উত্তর দিবার চেষ্টাও করিতে পারিলেন না।

রাজা কহিলেন—"কেন মারিবে ভাই? রাজ্যের লোভে? তুমি কি মনে কর, রাজ্য কেবল সোণার সিংহাসন, হীরার মুকুট ও রাজছত্র? এই মুকুট, এই রাজছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার কত তাহা জান? শত সহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। রাজ্য পাইতে চাও ত সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ কর, সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ কর,—এ যে করে সেই রাজা; সে পর্ণকুটীরে থাক্ আর প্রাসাদেই থাক্। যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে সকল লোক ত তাহারই! তাহার ঐশ্বর্য্য, তাহার গৌরব, তাহার সুখ, অক্ষৌহিণী সৈন্য আসিয়া কাড়িতে পারে না। পৃথিবীর দুঃখ হরণ যে করে, সেই পৃথিবীর রাজা, পৃথিবীর অর্থ ও রক্তশোষণ যে করে সে ত দস্যু;—সহস্র অভাগার অশ্রুজল তাহার মস্তকে অহর্নিশ বর্ষিত হইতেছে, সেই অভিশাপধারা হইতে কোন রাজচ্ছত্র তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। তাহার প্রচুর রাজভোগের মধ্যে শত শত উপবাসীর ক্ষুধা লুকাইয়া আছে। অনাথের দারিদ্র্য গলাইয়া সে সোণার অলঙ্কার করিয়া পরে, তাহার আজানুলম্বিত রাজবস্ত্রের মধ্যে শত শত শীতাতুরের মলিন ছিন্ন কন্থা। রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই—পৃথিবীকে বশ করিয়া রাজা হইতে হয়।"

গোবিন্দমাণিক্য থামিলেন, নক্ষত্র রায়ও মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।



মহারাজ খাপ হইতে তরবারী খুলিলেন। নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন,—"ভাই, ভাই! এখানে লোক নাই, সাক্ষ্য নাই, কেহ নাই—ভাইয়ের বক্ষে ভাই যদি ছুরি মারিতে চায়, তবে তাহার স্থান এই—সময় এই—এখানে কেহ তোমার নিন্দা করিবে

না। তোমার শিরায় আর আমার শিরায় একই রক্ত বহিতেছে—একই পিতার, একই পিতামহের রক্ত.—তুমি সেই রক্তপাত করিতে চাও, কিন্তু মনুষ্যের আবাসস্থলে করিও না। কারণ যেখানে এই রক্তের বিন্দু পড়িবে, সেইখানেই অলক্ষ্যে ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে। পাপের শেষ কোথায় গিয়া হয় কে জানে? পাপের একটী বীজ যেখানে পড়ে সেখানে দেখিতে দেখিতে গোপনে কেমন করিয়া সহস্র বৃক্ষ জন্মায়, কেমন করিয়া অল্পে অল্পে সুশোভন মানব সমাজ অরণ্যে পরিণত হইয়া যায়---তাহা কেহ জানিতে পারে না। অতএব নগরে, গ্রামে যেখানে নিশ্চিন্ত চিত্তে পরম স্নেহে ভাইয়ে-ভাইয়ে গলাগলি করিয়া আছে, সেই ভাইদের নীড়ের মধ্যে রক্তপাত করিও না; এইজন্য তোমাকে আজ অরণ্যে ডাকিয়া আনিয়াছি।

এই বলিয়া রাজা নক্ষত্ররায়ের হাতে তরবারি দিলেন। নক্ষত্র রায়ের হাত হইতে তরবারি ভূমিতে পড়িয়া গেল। নক্ষত্ররায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "দাদা আমি দোষী নই---একথা আমার মনে কখনও উদিত হয় নাই।

রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,---"আমি তাহা জানি। তুমি কি কখন আমাকে আঘাত করিতে পার? তোমাকে পাঁচ জনে মন্দ পরামর্শ দিয়াছে।"

প্রশ্ন

১। রাজা কে? রাজকর্ত্তব্য কি?—এই প্রবন্ধের বর্ণন অনুসারে বল।

২। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ভ্রাতৃত্ব ও ভ্রাতৃস্নেহ সম্বন্ধে কি শিখিলে?

৩। স্নেহপ্রেমহীন হানাহানির রাজ্য, অনিমেষনেত্র, অদৃষ্টের মত নীরব—এই পদগুলির অর্থ কর।

হৃদয়ের দান

প্রবন্ধেব বর্ণনীয বিষয় ঃ—১। হিন্দুব দযা ও দান ধর্ম্মেব মূলনীতি। ২। শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে উদাহবণ দ্বাবা উপদেশ। ৩। বর্ত্তমান সভ্য সমাজেব প্রবৃত্তি। ৪। যথার্থ দান প্রবৃত্তিব উদাহবণ।

কোন্ কাজে পুণ্য হয, কোন কাজে অধর্ম্ম হয---দেশভেদে ইহাব মীমাংসাব বহু ভেদ থাকিলেও দুঃখীব দুঃখ দূব কবা যে একটি পবম ধর্ম্ম, ইহা সকল সভ্য দেশেই স্বীকৃত হইযা থাকে। 'নোপকাবাৎ পবোধর্ম্মঃ"---আমাদেব শাস্ত্রেব প্রধান উপদেশ ; দযা বা 'চ্যারিটি' সকল ধর্ম্মের মূল বলিয়া বাইবেলে উক্ত হইযাছে ; সর্ব্ব জীবে দয়া বৌদ্ধধর্ম্মেব সার উপদেশ। বাস্তবিক দযাব বাড়া আর ধর্ম্ম নাই। যিনি প্রকৃত দয়ালু, পরোপকার সাধনে যিনি সতত ব্যগ্র, দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে পারিলেই যিনি আপনাকে সফলজন্মা মনে করেন---সর্ব্বত্র সকল সমাজে তাঁহাব আদব, সকলেব কাছে তাঁহাব সম্মান।

আজি কালি কথা উঠিয়াছে যে, দয়া অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কি সকলকেই দান করিতে হইবে.? দানের কি পাত্রাপাত্র নাই? সময় অসময় নাই? আমাদের শাস্ত্রের সাধারণতঃ যেরূপ উপদেশ এবং সাধারণ লোকের যেরূপ প্রবৃত্তি, তাহাতে আমরা এই বুঝি যে, কাহারও দুঃখে হৃদয় কাতর হইলেই, তৎক্ষণাৎ তাহার সেই দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিবে ;

সাধারণতঃ দয়ার কার্য্যে পাত্র বিবেচনা করিবে না,---সময়-অসময় ভাবিবে না। কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনে তর্ক হয়। অর্জ্জুন বলেন যে, যুধিষ্ঠির বড় দাতা, শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে যুধিষ্ঠির কেতাবী দাতা, কিন্তু আসল দাতা কর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ আপনার কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিবার জন্য অর্জ্জুনকে প্রচ্ছন্নভাবে দূরে রাখিয়া আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-বেশে যমুনা-তীরে দণ্ডায়মান রহিলেন। যুধিষ্ঠির অবগাহনার্থ যমুনা-তীরে উপস্থিত, সঙ্গে অনুচরবর্গ তর্পণের কোশাদি এবং কৌষেয় বস্ত্রাদি লইয়া আছে। ব্রাহ্মণরূপী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আমি দরিদ্র, ভিক্ষার্থী। মহারাজের স্থানে কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা করি।" যুধিষ্ঠির বিনয়ে বলিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ, আমি অস্নাত, অশুচি ক্ষত্রিয়। এরূপ অবস্থায় আমি আপনাকে কিছু দান করিতে পারি না। আপনি যদি অপেক্ষা করেন, আমি স্নান-আহ্নিক-সমাপনান্তে আপনাকে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ দান করিতে পারি।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সরিয়া গেলেন। রৌপ্য-কোশা লইয়া বীর কর্ণ যমুনায় স্নান করিতে আসিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি দরিদ্র, আপনার নিকট কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা করি।" কর্ণ বলিলেন, "এখন আর কিছু ত নাই, এই কোশাখানি লউন।" অর্জ্জুন সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আপনি অস্নাত অশুচি, পিতৃ-তর্পণের উপকরণ ব্রাহ্মণকে দান করিতেছেন, একটু অপেক্ষা করিলেই ত হইত"? কর্ণ বলিলেন, "অপেক্ষা করিব কি?---যদি স্নান করিয়া আসিবার সময় দানের প্রবৃত্তিটুকু না থাকে, অথবা স্নান করিবার সময় যদি কুম্ভীরে লইয়া যায় বা অন্য কোন প্রকারে মৃত্যু হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণকে ত কিছু দেওয়া হইল না।

যখন মন হইবে আর হাতে কিছু থাকিবে তখন দিতে পারিলেই ভাল।”

অর্জ্জুন বুঝিলেন যে, কর্ণই প্রকৃত দাতা বটে। অর্জ্জুনের সঙ্গে ভারতবাসীও এত কাল তাহাই বুঝিয়াছিল।

এখন নূতন সভ্যতায় লোককে সকল বিষয়েই হিসাবী হইতে বলিতেছে, দান কার্য্যেও বাঙ্গালীকে হিসাবী হইতে বলিতেছে। বাঙ্গালী নূতন সভ্যতায় মুগ্ধ হইয়াছে। আপনার বুদ্ধিবিদ্যাপ্রদর্শনার্থ বুক ফুলাইয়া বলিতেছে, ‘যাহাকে তাহাকে দান করিয়া দেশটাকে আর ডুবাইয়া দেওয়া হইবে না, দেশের নিষ্কর্ম্মা অলস লোককে আর প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। সকলে মিলিয়া আমরা পাত্র পরীক্ষা করিয়া তবে দান করিব।” সুতরাং হৃদয়ের দান কমিয়া গিয়া হিসাবের দানের ধূয়া উঠিতেছে।

উদরান্নের প্রত্যাশায় কেনারাম তোমার দ্বারে উপস্থিত। তুমি ইংরাজীতে পণ্ডিত, অবশ্যই তুমি মিলের অর্থনীতি শাস্ত্রের নাম শুনিয়াছ—তুমি স্বচ্ছন্দে কেনারামকে বলিলে, “আমি তোমাকে অন্ন দিয়া পাপের ভার বহন করিতে পারি না। তোমার দেহে যে বল আছে, তুমি স্বচ্ছন্দে পরিশ্রম করিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পার।” কেনারাম কাতরস্বরে বলিল, “হুজুর যা বলিতেছেন, তা ঠিক। আমি দেশ হইতে মজুরী করিতেই আসি; দুই তিন দিন ঠিকে কাজ করিয়াছিলাম, যাহা পাইয়াছি এই কয়দিনে খাইয়া ফেলিয়াছি। কাল হইতে আহার জোটে নাই বলিয়া আপনার দ্বারে আসিয়াছি; আবার দুটি আহার পাইলে খাটিয়া খাইতে পারি।” এখনকার সভ্যতার রীতি এই যে, যত লোককে

প্রকাশ্যতঃ অপ্রকাশ্যতঃ অধিক অবিশ্বাস করিতে পার, ততই তুমি অধিক বুদ্ধিমান। তুমি তোমার পারিষদ্‌বর্গের প্রতি চাহিয়া বুদ্ধিমানের হাসি হাসিয়া বলিলে, "পাড়াগেঁয়ে লোক মনে করে যে, সহরের লোক বোকা, তাহাদিগকে অনায়াসে ঠকান যায়।—আচ্ছা বাপু, তুমি যদি ক্ষুধায় কাতর তবে অত বক্তৃতা করিলে কিরূপে ?" কেনারাম উত্তর দিতে যাইতেছিল, তুমি ভ্রূকুটি করিয়া বলিলে, "যাও।" তোমার পারিষদেরা জানে তুমি কখন কখন তোমার দারুণ তেজস্বিতা সংযত রাখিতে না পারিয়া অতিথি-ফকীরকে চড়টা চাপড়টা দিয়া থাক,—কাজেই তাহারা বলিল, "আর কেন বাপু, অন্যত্র দেখ না কেন ? বাবুর সঙ্গে তর্কবিতর্কে কাজ কি ?"

কেনারাম শ্রীমানের ভবন হইতে ছলছল নেত্রে ফিরিয়া সুবিধা পাইয়াও আর দুই তিন বাড়ী প্রবেশ করিল না। কিন্তু উদরের জ্বালা বড় জ্বালা, আর এক বাড়ী প্রবেশ করিল। তাহারা বলিল, "এমন চাল সস্তায় এত ভিখারীও হইয়াছে! না বাপু, এখানে কিছু হবে না।" আর এক জনেরা বলিল, "বুধবারে আসিও।" কেনারাম চলিয়াছে ; চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, "এখন দরোয়ান কোথায় গিয়াছে।" পঞ্চম গৃহস্বামী এক মুষ্টি তণ্ডুল আনিয়া দিল। কেনারাম চক্ষের জলমাত্র দিয়া তাহাকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিল। সে সেই তণ্ডুলগুলি চর্ব্বণ করিতে করিতে পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়া জল পান করিল। চট্টোপাধ্যায় আহ্নিক করিতেছিলেন, কেনারাম গণ্ডূষ গণ্ডূষ জল খাইতেছে দেখিয়া জল হইতে উঠিয়া বলিলেন, "তুমি কাদের বাড়ী কাজ করিতেছ বাপু ?" কেনারাম বলিল, মহাশয়, আজ কাজ করিতে পারি নাই, কাল হইতে খাওয়া হয়

নাই।” ব্রাহ্মণ আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতেছেন দেখিয়া কেনারাম আপনার দুঃখের কথা বলিল। চট্টোপাধ্যায় কেনারামকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন; প্রথমে চারিটী জলপান দিলেন, তাহার পর নিজের আহার হইলে কেনারামকে প্রসাদ দিলেন। কেনারাম উদর পুরিয়া খাইল, মন ভরিয়া ব্রাহ্মণের মঙ্গল কামনা করিল।

কেনারামকে অন্নদান করিয়া চট্টোপাধ্যায়ের যে আত্মপ্রসাদ হইল নূতন সভ্যতার হিসাবী দানে তাহা পাওয়া যায় কি? আমরা বিবেচনা করি, সামাজিক দান বা ‘পাব্‌লিক চ্যারিটি’ দ্বারা এ সুখ কখনই পাওয়া যায় না। যাহাতে সুখের নূতন নূতন পন্থা পাওয়া যায় তাহারই নাম সভ্যতা—অতএব যাহাতে সুখের এরূপ একটি দ্বার রুদ্ধ হইতেছে, তাহা সভ্যতা বলিব কেন?

প্রশ্ন

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ ও সমাসাদি বল।

সফলজন্মা, বুদ্ধিবিদ্যা প্রদর্শনার্থ, পিতৃতর্পণ, অর্থনীতিশাস্ত্র।

২। আসল দান ও কেতাবী দান—এই দুই বাক্যে কি বুঝিলে? উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

৩। হিন্দুর দানধর্ম্মের মূলনীতি কি? এই প্রবন্ধ হইতে উদাহরণ সাহায্যে বুঝাও।

জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সন

প্রবন্ধের বর্ণনীয় ও প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ—জর্জ্জ ষ্টিফেন্সনের সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণন। একাগ্রতা, অধ্যবসায়, ঐকান্তিক সাধনা ও পরিশ্রম বলে মানব অতি হীন অবস্থা হইতেও অত্যুচ্চ গৌরবজনক অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে ইহাই শিক্ষণীয় বিষয়।

তোমরা বোধ হয়, অনেকেই রেলের গাড়ী চড়িয়াছ। রেলগাড়ী চড়িয়া আমরা একস্থান হইতে অন্য স্থানে কত অল্প সময়ের মধ্যে যাইতে পারি, তাহাও তোমরা দেখিয়াছ। রেলগাড়ী না থাকিলে, দ্রুত গমনাগমন সম্ভব হইত না। রেলগাড়ীর দ্বারা সভ্যতার অদ্ভুত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এমন বাষ্পীয় শকট যিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা আজ তোমাদিগকে বলিব।

জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সন ১৭৮১ খৃঃ অব্দে ৯ই জুন, ইংলণ্ডের অন্তর্গত নিউক্যাস্‌ল্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। জর্জ্জের পিতামহ গরু চরাইতেন। তাঁহার পুত্র অর্থাৎ জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সনের পিতা রবার্ট ষ্টিফেন্‌সন একটী কয়লার খনিতে এঞ্জিনে কয়লা প্রদান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহাদের ছয়টি পুত্র কন্যাদের মধ্যে জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সন দ্বিতীয়। রবার্টের সাংসারিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। তিনি সপ্তাহে কেবল ৬৲ টাকা উপার্জ্জন করিতেন; ইংলণ্ডের ন্যায় স্থানে মাসিক ২৪৲ টাকা আয়ে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাওয়াই কঠিন, তাহার উপর সন্তানদিগের বস্ত্রাদি ক্রয়

করা ও বিদ্যাশিক্ষা দান করা ত দূরের কথা। এজন্য রবার্ট কোন ছেলেকেই শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু দরিদ্র হইলেও সন্তানদিগকে কিছু শিক্ষা দান করা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তিনি সন্ধ্যার সময় তাহাদিগকে লইয়া রবিন্‌সন ক্রুসোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রভৃতির গল্প শুনাইতেন এবং ছুটির দিনে রবার্টকে সঙ্গে লইয়া মাঠে গমন করিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখাইতেন; ভাল ভাল ফুল ফল ও পক্ষী সকল দেখাইয়া তাহার কোমল প্রাণে তাহাদের প্রতি ভালবাসার সূত্রপাত করিতেন।

দরিদ্র গৃহের সন্তানদিগকে অতি অল্প বয়সে উপার্জ্জন করিয়া পিতামাতার দুঃখ দূর করিতে হয়। জর্জ্জ যখন আট বৎসরের বালক তখন সে এক বিধবার গরু চরাইত। সে এই রাখালি করিয়া প্রতিদিন ছয় পয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিল; পরে আর একটু অধিক বয়সে লাঙ্গল লইয়া জমিতে চাষ করিয়া প্রতিদিনে নয় দশ পয়সা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। জর্জ্জ বাল্যকাল হইতেই সরলতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছিল। সূর্য্যোদয়ে সে ক্ষেত্রে লাঙ্গল চালাইবার জন্য বাহির হইয়া যাইত এবং সূর্য্য যখন পশ্চিম গগনে অস্ত যাইতেন, তখন এই দীর্ঘাকৃতি, প্রফুল্লচিত্ত বালক আনন্দমনে দিবসের কার্য্য শেষ করিয়া গুণগুণ রবে গান করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিত।

উন্নতির স্পৃহা মানুষের মনে যখন একবার জাগিয়া উঠে, তখন তাহা আর সহজে নির্ব্বাপিত হয় না। অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে জর্জ্জ ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কৃষকের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি ক্রমে কয়লার খনিতে প্রবেশ

করিলেন এবং তথায় এঞ্জিন তত্ত্বাবধারণের ভার প্রাপ্ত হইলেন। এই কার্য্যে তাঁহার আয়ও ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

জর্জ্জ বাটীতে আসিয়া ছোট ছোট এঞ্জিন প্রস্তুত করিতেন। এঞ্জিন তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়া উৎকৃষ্ট এঞ্জিন নির্ম্মাতা হইবার স্পৃহা তাঁহার মনে বলবতী হইয়া উঠিল। এই কার্য্য করিবার কিছুকাল পরে তিনি খনিতে কলের দ্বারা জল উঠাইবার তত্ত্বাবধান কার্য্যে নিযুক্ত হন। যদি জল তুলিবার কলের কোন স্থানে কোন দোষ ঘটিত, জর্জ্জ তৎক্ষণাৎ আপনার বুদ্ধিকৌশলে তাহা সংশোধন করিয়া সুশৃঙ্খল ভাবে কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

তোমরা অনেকেই তোমাদের পড়িবার পুস্তকে জেম্‌স ওয়াট নামক এক সাহেবের বিষয় পড়িয়াছ। ইনি একবার দেখেন, যে জল গরম করিবার সময় কেটলীর ঢাকিনাটা একবার উপরে উঠিতেছে, আবার কিছু বাষ্প বাহির হইয়া গেলেই কেটলীর মুখে আসিয়া পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি বাষ্পের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পান এবং সেই শক্তি দ্বারা যে কত কার্য্য হইতে পারে, সেই বিষয়ে পুস্তক রচনা করেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে এঞ্জিন উদ্ভাবিত হয়। জর্জ্জ এখন আঠার বৎসরের যুবক হইলেও পুস্তক পড়িবার মত শিক্ষা কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। পুস্তকাদি পাঠে বঞ্চিত থাকা জর্জ্জের আর ভাল লাগিল না, তিনি এক নৈশবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া কতক পরিমাণে শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন। গণিতে তাঁহার অধিক ঝোঁক ছিল—কি নৈশবিদ্যালয়ে কি কার্য্যক্ষেত্রে তিনি যখন অবসর পাইতেন, তখনই অঙ্ক কস্‌িতে প্রবৃত্ত হইতেন।

সকল উন্নতির মূলেই যে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন, ইহা তিনি নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হইবার সময় ভালরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নিয়মিত কার্য্যের মধ্যেও লোকের জুতা সেলাই করিয়া কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন।

যে ব্যক্তি পৃথিবীতে অসাধারণ, তাহার কার্য্যাদি সাধারণ লোকের অপেক্ষা স্বতন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। জর্জ্জের সঙ্গে কয়লার খনিতে যাহারা কাজ করিত, তাহারা শনিবার রজনীতে সুরাপান ও অন্যান্য মন্দ কার্য্যে সময় অতিবাহিত করিত, জর্জ্জ সেই সময়ে একটা এঞ্জিন লইয়া তাহার অংশগুলি খুলিয়া তাহাদের গঠন প্রণালী ভাল করিয়া দর্শন করিতেন এবং পুনরায় বিচ্ছিন্ন অংশগুলি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া নিজ বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশীলতাব পরিচয় দান করিতেন।

জর্জ্জের ভাগ্যসূর্য্য ক্রমে উদিত হইতে লাগিল, তাঁহার দারিদ্র্য ক্রমে ঘুচিতে লাগিল। তিনি এই সময়ে বিবাহ করেন। আমাদেব দেশের ছেলেরা উপার্জ্জনক্ষম হইতে না হইতেই যেমন অনেক সময় পিতা মাতা তাহাদের বিবাহ দিয়া থাকেন, ইংরাজদিগের দেশে সে রীতি নাই। ছেলেরা নিজে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হয়। কর্ত্তব্যশীল, সৎ, অসাধারণ পরিশ্রমী জর্জ্জ সপ্তাহে যথেষ্ট টাকা উপার্জ্জন করিতেন। এখন বিবাহিত হইয়া তিনি নিজ অবস্থার আরও উন্নতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবন-চরিত লেখকরা বলেন জর্জ্জের পত্নী তাঁহার সংসার বড় সুখী করিয়াছিলেন। তিনি পরিশ্রম, মিতব্যয় ও সৎপরামর্শ প্রভৃতির দ্বারা স্বামীর উন্নতি সাধনে যত্নবতী ছিলেন। তাঁহাদের একটী

সন্তান হইয়াছিল। জর্জ্জ দারিদ্র্যের পীড়নে ভালরূপ শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া সৌভাগ্যের দিনে সন্তানের শিক্ষাদানে বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন।

খনির অভ্যন্তরে কাজ করিবার জন্য, জর্জ্জ স্বনামপ্রসিদ্ধ এক ল্যাম্প বাহির করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত এই আলোকের দ্বারা শত শত লোকের প্রাণরক্ষার উপায় হইয়াছিল। কয়লার খনির নিম্নতর প্রদেশ হইতে সময়ে সময়ে এক প্রকার গ্যাস নির্গত হয়; এই গ্যাস যখন আলোকের শিখার সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তখন তাহা জ্বলিয়া কামানের ন্যায় শব্দ হয় এবং খনিস্তর সকল চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। এইরূপ ঘটনায় সহস্র সহস্র দরিদ্র কয়লা-খননকারীর জীবন বিনষ্ট হইয়াছে। কলের গাড়ীর সৃষ্টিকর্ত্তা জর্জ্জ এইজন্য এক ল্যাম্প বাহির করেন। এই ল্যাম্প এরূপ সুকৌশলে নির্ম্মিত যে বাহিরের সহজদাহ্য গ্যাসের সহিত অভ্যন্তরস্থ আলোক-শিখার কোন মতে সংমিশ্রণ হইতে পারে না। এই ল্যাম্প লইয়া জর্জ্জ স্বয়ং খনির মধ্যে প্রবেশ করেন এবং নিরাপদে তথা হইতে বহির্গত হইয়া আসেন। এই ল্যাম্পের জন্য তিনি পারিতোষিক স্বরূপ অনেক সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে ডেভিস নামক এক বৈজ্ঞানিক আরও উন্নত ধরণের ঐরূপ আর এক ল্যাম্প বাহির করেন। এই ল্যাম্প জর্জ্জের ল্যাম্প অপেক্ষা খনির পক্ষে অধিকতর নিরাপদ হইয়াছিল।

জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সন যেখানে থাকিতেন সেই নিউ ক্যাসেল্ নামক স্থানটি কয়লার ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। তথা হইতে শত শত মণ কয়লা গরুর গাড়ি করিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরিত

হইত। সহজে ও সুলভে প্রেরণ করিবার জন্য জর্জ্জ লোহার লাইনের উপর দিয়া বাষ্পীয় শকট যোগে এই কয়লা পাঠাইবার কল্পনা করিতে লাগিলেন। অনুকূল ও প্রতিকূল নানারূপ আলোচনার পর অবশেষে একজন বিখ্যাত কয়লা ব্যবসায়ী জর্জ্জকে এই কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন। তৎপরে বিলাতের মহাসভায় এই প্রস্তাব উপস্থিত হয়। প্রথমে অনেকে ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর এই প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইয়া যায়। কয়লার ট্রেণ যখন চলিতে লাগিল, তখন জর্জ্জ ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে লিভারপুল পর্য্যন্ত লোক লইয়া যাইবার জন্য ট্রেণ চালাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন; পূর্ব্বের ন্যায় এ প্রস্তাবও পার্লামেণ্টে উপস্থিত হয়; কয়লার ট্রেণ চালাইবার প্রস্তাবের ন্যায় ইহাতেও প্রথমে আপত্তি উত্থাপিত হয়। মহাসভার অধিকাংশ সভ্য আপত্তি উত্থাপন করিয়া প্রস্তাব ধার্য্য হইবার পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে তৃতীয় বারে এই প্রস্তাবের পক্ষে সহানুভূতি-সম্পন্ন কোন কোন লোকের সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় অধিকাংশ লোকে এই প্রস্তাবের পোষকতার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল এবং অধিকাংশ লোকের মতে অবশেষে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

লিভারপুল হইতে ম্যাঞ্চেষ্টার স্থল পথে ছত্রিশ মাইল। এই পথ অনেক স্থানে জঙ্গল, জলাভূমি ও পাহাড় শ্রেণীতে পূর্ণ ছিল। এই সকল পরিষ্কার করিয়া লাইন বসান সোজা কথা নহে। রেলওয়ে পরিচালন-কমিটি বহু লোক নিযুক্ত করিয়া জঙ্গল পরিষ্কার, পর্ব্বত বিদারণ প্রভৃতি দুঃসাধ্য কার্য্য সাধন করিয়া লন। নব গঠিত

এই কমিটি জর্জ্জ ষ্টিফেন্সন্‌কে ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত করেন। জর্জ্জও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই দুর্গম পথ ট্রেণ চলিবার উপযোগী করিয়া তুলিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর অল্প সংখ্যক লোক লইয়া বাষ্পীয় শকট লিভারপুল হইতে ম্যাঞ্চেষ্টার অভিমুখে ছুটিল। এই নূতন ব্যাপার দেখিবার জন্য সে স্থানে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল। তখন শত কণ্ঠে জর্জ্জের সাধুবাদ ধ্বনিত হইতে লাগিল, এই দর্শকবৃন্দের মধ্যে ডিউক অব ওয়েলিংটন, সার রবার্ট পিল প্রভৃতি ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান লোক উপস্থিত ছিলেন। জর্জ্জ ষ্টিফেন্সনের প্রতিভাবলে সে দিন ইংলণ্ডে যে নব যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল, সমস্ত জগতের ইতিহাসে তাহা স্মরণীয় দিন।

জর্জ্জ বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়া বৃদ্ধ বয়সে নির্জ্জন স্থানে সুন্দর বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। বাল্যকালে প্রকৃতি ও পশুপক্ষীদিগের প্রতি তাঁহার ভালবাসা জন্মিয়াছিল। তিনি তাঁহার সুন্দর বাটীর সম্মুখভাগ বিবিধ ফুলের গাছে পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই শোভিত তপোবন তুল্য স্থানে কয়েকটি পশু তাঁহার আদরের সামগ্রী হইয়া তাঁহার মনে আনন্দ উৎপাদন করিত। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দের ১২ই আগষ্ট, ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই মহৎ জীবন হইতে তোমরা এই শিখিলে, যে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে মানুষ অতি সামান্য অবস্থা হইতেও উন্নতির অতি উচ্চ শিখরে উঠিতে সমর্থ হয়।

প্রশ্ন

১। বাষ্পীয় শকট আবিষ্কারের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণন কর।
২। ষ্টিফেন্সনের জীবনী পাঠে কি শিখিলে ?

বোম্বাই

প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয়ঃ—বোম্বাই নগরের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও তৎসহিত পার্শী সমাধি মন্দির, এলিফ্যাণ্টা দ্বীপ প্রভৃতির বর্ণন।

বরদায় একদিন মাত্র থাকিয়া আমরা বোম্বাই যাই। "বোম্বাই" নাম সম্বন্ধে দুইটী প্রবাদ আছে। ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে যখন পর্ত্তুগিসেরা এ স্থানটী অধিকার করে, তখন ইহার 'বুয়ন বহিয়া'—উৎকৃষ্ট বন্দর—নাম রাখে। তাহা হইতে বোম্বাই হয়। দ্বিতীয় প্রবাদ—'মম্বাই' বলিয়া এক দেবী ছিলেন। তাঁহার নাম হইতে ইংরাজেরা বোম্বাই বা বম্বে করিয়াছেন। এখনও বোম্বাই সহরের একটী অংশের নাম 'মম্বাইদেবী' আছে। আর একটী অংশের নাম কামদেবী।

বোম্বাই আমার কাছে শ্যামা ভারতমাতার জিহ্বা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। জননীর পশ্চিম তীর ব্যাপিয়া, উত্তর দক্ষিণ ঘাট গিরিমালা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরবৎ শোভা পাইতেছে। এই গিরিশ্রেণীই আমাদের কবিকল্পনার অবলম্বন 'মলয়াচল'। এই শৈলসমাচ্ছন্ন তীর হইতে জিহ্বার মত একটি ভূমিখণ্ড সমুদ্রবক্ষে ভাসমান। শ্যামার জিহ্বা রক্তবর্ণা। শ্যামা ভারতমাতার জিহ্বা শ্যামপত্র-সমাচ্ছন্ন সৌধ ও শৈলমালায় উদ্যানবৎ শোভিত। শ্যামার জিহ্বার চারিদিকে রক্ত-ফোঁটা চিত্রিত হইয়া থাকে। এ শ্যামা জিহ্বার চারিদিকে ফোঁটার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈল-দ্বীপরাশি নীল সমুদ্রগর্ভে শোভা পাইতেছে। এখন বুঝিলে, বোম্বাই কি মনোহর উপদ্বীপ?

ইহার তিন দিকে সমুদ্র পরিখার মত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এ সমুদ্রে তরঙ্গ নাই, লহরী নাই, গর্জ্জন নাই। শান্ত, স্থির, নীরব। যেন একখানি অনন্ত নীল আরসি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে এক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ যেন এক একটী সুন্দর ফুলেব মত শোভা পাইতেছে। বোম্বাইয়ের পার্শ্বে নানা স্থানে সমুদ্র-শাখা ভূমি মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এ সকল শাখার উপর দিয়া রেলওয়ের দীর্ঘ সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। গাড়ীতে এই সলিলরাশির উপর দিয়া উভয় পার্শ্বে সুপারি, তাল, নারিকেল, খর্জ্জুর বৃক্ষ শোভিত গিরিমালার মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে, কি চঞ্চল চিত্ত-বিনোদন প্রাকৃতিক শোভাই প্রাণমন মোহিত করিয়া দেয়।

আমরা প্রথমেই জিহ্বার অগ্রভাগস্থ পর্ব্বতস্থিত ইংরাজদিগের বসতিস্থান দেখিতে যাই। পর্ব্বতটীর নাম "মেলেবার হীল"; তাহার প্রান্তসীমাগ্রে শৈবালসমাবৃত হংসের ন্যায় বোম্বাইয়ের গবর্ণরের রাজপ্রাসাদ সমুদ্রে ভাসিতেছে। এই পর্ব্বতটী ইংরাজ-দিগের গৃহাবলীতে সমাচ্ছন্ন। উভয় পার্শ্বের সমুদ্র সকল গৃহ হইতে দেখা যায়; পর্ব্বতটীর সর্ব্বত্র পথমালা এরূপ বিচিত্র কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, সকল দিকে গাড়ী চলিয়া যায়। রক্তবর্ণ রাজপথসমূহ গিরি-অঙ্গে যেন প্রবালহারাবলীর মত শোভা পাইতেছে। উভয় পার্শ্বে মনোহর সৌধ ও উদ্যানমালা এবং তাহার বিরাম-স্থান-পথে সমুদ্রের নীল কান্তি দর্শন করিয়া শকট ভ্রমণ কি মনোহর।

ফিরিবার সময়ে এই পর্ব্বতস্থিত পার্শীদিগের "নীরব মন্দির" বা সমাধিস্থান দর্শন করি। মুল সমাধিস্থানটী একটী গোলাকার প্রাচীর

মাত্র। তাহার অন্তবর্ত্তী স্থানটী চক্রাকারে তিন মণ্ডলে বিভক্ত করা হইয়াছে। কেন্দ্রস্থলে একটী কূপ; তাহাকে বেষ্টিয়া যে মণ্ডল, তাহাতে শিশুদিগের, তাহার বাহিরের মণ্ডলে রমণীদিগের, তাহার বাহিরের মণ্ডলে পুরুষদিগের শব রক্ষিত হয়। প্রাচীরের এক স্থানে এক গবাক্ষ আছে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা এই গবাক্ষ পর্য্যন্ত শব লইয়া গেলে, সমাধিস্থিত দুই জন ভৃত্য এখান হইতে শব ভিতরে লইয়া যায়। তাহারা ভিন্ন অন্য কেহ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার পর শবটীর বসন মোচন করিয়া, উপযুক্ত মণ্ডলে রাখিয়া দেয়। অল্পকাল মধ্যেই শকুনে তাহা নিঃশেষ করিলে ভৃত্যেরা অস্থি সকল মধ্য-কূপের গর্ভে ফেলিয়া দেয়। কালে উহা চূর্ণে পরিণত হইয়া, কূপতলস্থ জলপ্রণালী দিয়া পর্ব্বতের উপত্যকায় গিয়া, ভূমির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। একটী গভীর তত্ত্ব পার্শীদিগের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ভিতরে নিহিত আছে। পার্শী ধর্ম্মনীতির মূল—সর্ব্বভূতহিত। শবটী পোড়াইয়া ফেলিলে কি কবর দিলে, আপাততঃ কাহারও হিতসাধন করা হয় না। কালে তাহা ভূমি জল, ইত্যাদি পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া, জীবহিত সাধন করে সত্য, তবে সে বহুকালসাপেক্ষ এবং তত্ত্বটী জটিল। পার্শীদিগের শব তৎক্ষণাৎ পশু পক্ষীর আহার হইয়া প্রত্যক্ষ জীবহিত সাধন করে এবং অস্থিও কালে ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। আমি ত মরিয়া গিয়াছি, সুখ দুঃখের অতীত হইয়াছি; অতএব, আমার লোষ্ট্রবৎ জীবনশূন্য দেহটী আহার করিয়া যদি কয়টী প্রাণীর তৃপ্তি হয়, ক্ষতি কি? দেহটী ধ্বংস করা না ভূগর্ভে

পচিতে দেওয়া অপেক্ষা, এরূপ জীবহিতে নিয়োজিত হওয়া কি ভাল নহে ?

পর দিবস নগর দর্শন করিতে করিতে আমরা খ্যাতনামা 'হস্তিগুম্ফা' দেখিতে যাই। বোম্বাই নগরটি দেখিতে অতি সুন্দর। কলিকাতার মত এত বৃহৎ অট্টালিকা নাই, তবে অট্টালিকাগুলি বহুতলবিশিষ্ট এবং বড় কবিত্বপূর্ণ। প্রত্যেক গৃহ নানারূপ বারাণ্ডা ও নানারূপ কোণবিশিষ্ট। আকৃতিবৈচিত্র্য বড় মনোহর। বোম্বাই নগরের দুইটী বিশেষ লক্ষণ,—অধিকাংশ অট্টালিকার সর্ব্বোচ্চ তলার ছাদ খোলার, এবং ফুল অতি বিরল। সমুদ্রের লবণাক্ত বাতাসে ফুল বাঁচে না, বোধ হয়। সমুদ্রানিল সলিলসিক্ত বলিয়া বোম্বাই অঞ্চলে গ্রীষ্মের প্রখরতা নাই এবং লবণাক্ত বলিয়া শীতেরও প্রবলতা নাই। এই পৌষ মাসের মধ্যভাগেও আমরা কিছুমাত্র শীত অনুভব করিলাম না। এই জন্যই কবিরা মলয়াচলকে চিরবসন্তের আলয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই জন্যই মলয়ানিলের এত গুণগান। তবে এ বসন্ত পুষ্পহীন বোধ হইল এবং এ মলয়াচলে চন্দনবৃক্ষ ও ভুজঙ্গ নাই বলিয়া, তারাচরণের দৃঢ় বিশ্বাস—মলয়াচল ব্রহ্মদেশে। জানি না, পাঠকমণ্ডলী ও সুধীগণ তারাচরণের প্রতি তাহার ধৃষ্টতার জন্য কোন্ দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন।

আমরা একখানি 'জালিবোট' ভাড়া করিয়া, সমুদ্রগর্ভস্থ এলিফেণ্টা বা হস্তিগুম্ফা-দ্বীপ দেখিতে গেলাম। সমুদ্রবিহার আমি এ জীবনে ভুলিব না। স্থানে স্থানে খণ্ড-পর্ব্বত সমুদ্রগর্ভে এক একটী দোলমঞ্চ কিংবা এক একখানি রথের মত ভাসিতেছে।

তাহার মধ্য দিয়া আমাদের তরণী ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। কোনও খণ্ডশৈলে ইংরাজরাজ বোম্বাই রক্ষণার্থ অস্ত্রাগার, কোথাও বা বারুদাগার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গবর্ণরের শ্বেত অট্টালিকাটী দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন একটী রাজহংস গিরিশিরে বসিয়া সমুদ্র শোভা দেখিতেছে। স্থানে স্থানে যুদ্ধপোত এবং বৃহৎ বাষ্পীয়পোত সকল সগর্ব্বে ভাসিতেছে। আমাদের ক্ষুদ্র তরণী হংসিনীর মত তাহাদের পার্শ্বে ক্রীড়া করিতে করিতে চলিয়াছে। বহুদূর গিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম—আহা! কি দৃশ্য!

"দূরে চক্রনিভ তন্বী, তমাল তালের লীলা,
কলঙ্ক রেখার মত শোভে লবণাম্বু বেলা।"

তমাল দেখি নাই। কিন্তু তালজাতীয়-বৃক্ষশীর্ষ-সমন্বিতা, বনরাজি-মণ্ডিতা, সৌধমালায় বিচিত্রিতা বোম্বাই নগরী কি শোভার ভাণ্ডারই লবণাম্বুতীরে খুলিয়া রাখিযাছে এবং কি মনোহর নীলদর্পণে কি মনোহর মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব দেখিতেছে। যে ব্যক্তি একবার সমুদ্রগর্ভ হইতে এই 'মলয়াধারের তীর সুবঙ্কিম' এবং এই মধ্যাহ্ন রবিকরে "মলয়াচলের-উজ্জ্বল-নীলিমা" নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছে, সে কখনও উহা ভুলিতে পারিবে না।

এলিফেণ্টা দ্বীপের পর্ব্বতটী বৃক্ষাবলীতে বড় সুন্দররূপে শোভা পাইতেছিল। এই পর্ব্বতের কটীদেশে হস্তীগুম্ফা, তাহা হইতে ইহার নাম 'এলিফেণ্টা, হইয়াছে। এই গুম্ফা-দ্বারে পুরাকালে একটি প্রস্তরের হস্তী ছিল। সমুদ্র-তীর হইতে গুম্ফা পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী উঠিয়াছে! জনৈক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও তাঁহার শ্বেতাঙ্গিনী প্রিয়া এখন গুম্ফার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহাদের পাশ

লইয়া গুম্ফা দর্শন করিতে হয়। দুইটিই বেশ ভদ্রলোক। যদিও বহুতর শ্বেতাঙ্গিনীরা তখন গুম্ফাদ্বারে বিরাজ করিতেছিলেন, কেহ পান করিতেছেন, কেহ ভক্ষণ করিতেছেন, কেহ সমুদ্র শোভার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া বৃক্ষ-দোলায় দুলিতেছেন তথাপি তাঁহারা আমাদের প্রভৃতি খুব ভদ্রতা দেখাইলেন। পর্ব্বতের প্রস্তববক্ষ কাটিয়া, রাজগিরের' শোনভাণ্ডার কক্ষের মত, কিন্তু তদপেক্ষা বড়, একটী কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে। কক্ষ-প্রাচীর বড় সুচারুরূপে নির্ম্মিত নহে। 'বরাবরের' গুম্ফা সকল এতদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, তাহাদের প্রাচীরে মুখ দেখা যায়, এমনি মসৃণ। তবে কক্ষটীব প্রাচীরের গায়ে বহুতর হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবী মূর্ত্তি স্থাপিতা রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি তত শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ না হউক, নিতান্ত মন্দ নহে। তাহার পার্শ্বে অসম্পূর্ণ আরো ২।৩টী. ক্ষুদ্র গুম্ফা আছে। আমার বোধ হইল, এই গুম্ফা বৌদ্ধদের কর্ত্তৃক তপস্যার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল ; পরে বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর, হিন্দুরা অধিকার করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ,—দুই স্থানে দুইটী শিবলিঙ্গ বসান হইয়াছে, দেখিলে বেশ উপলব্ধি হয় যে, সেখানে অন্য কোনও মূর্ত্তি ছিল, তাহা উঠাইয়া শিবলিঙ্গ স্থাপিত করা হইয়াছে। গর্ত্তটী লিঙ্গ অপেক্ষা বড়। এই পর্ব্বত হইতে চতুর্দ্দিকস্থ সমুদ্রগর্ভে ভাসমান পার্ব্বত্য দ্বীপপুঞ্জ ও সমুদ্রশোভা দেখিলে চোক ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। মুহূর্ত্ত এই শোভা দেখিয়া আমরা ফিরিলাম। প্রতিকুল বাতাসের জন্য অর্দ্ধ পথ আসিলেই সন্ধ্যা হইল, জ্যোৎস্না উঠিল ; পটপরিবর্ত্তন হইয়া জ্যোৎস্নাপ্রোদ্ভাসিত, পর্ব্বত-দ্বীপ-খচিত, সমুদ্রের কি মনোমুগ্ধকর শোভা হইল। মনের আনন্দে সকলে মিলিয়া গাহিতে গাহিতে

বোম্বাই ফিরিয়া আসিলাম। গীত যেন আপনি হৃদয় উচ্ছ্বাসিত করিয়া উঠিতেছে, তরণী যেন সেই গীতের তালে তালে মনের আনন্দে নাচিতেছে। পূর্ব্ব দিন মলয়-পর্ব্বত-শিরে দাঁড়াইয়া এই সমুদ্রের দিকে চাহিয়া, আমিও বাইরণের মত স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—

মলয় বোম্বাই বক্ষে ;
বোম্বাই সমুদ্র তীরে ;
তথা দাঁড়াইয়া একা দেখিনু স্বপনে—
ভারতের সুখসূর্য্য আসিবে রে ফিরে।

বাইরণের স্বপ্ন ফলিয়াছে ;—গ্রীসের সুখের দিন ফিরিয়াছে। আমার স্বপ্ন ফলিবে কি ?

প্রশ্ন

১। বোম্বাই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কি জান বল।
২। বোম্বাই নগর ও এলিফ্যাণ্টা দ্বীপ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৩। পার্শী সমাধি রীতি বর্ণন ; উক্ত রীতিব মূলে কি নীতি আছে ?

সূর্য্য

প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয় ঃ—সূর্য্য,—পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্য—তাঁহার আয়তন, গতি আলোক ও উত্তাপের বিবরণ।

প্রভাকর সৃষ্টিকর্ত্তার অসীম শক্তির জ্বলন্ত চিহ্ন এবং অপার করুণার অপূর্ব্ব নিদর্শন। বাস্তবিক সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বা তাহার বিষয় মনে মনে চিন্তা করিলে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারি না। অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পয্যন্ত, সূয্য সমভাবে মানবসমাজের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। হিন্দু, পার্শী প্রভৃতি প্রাচীন কালের সুসভ্য জাতি সকল সূর্য্যকে অনন্তশক্তিমান্ ভগবানের শ্রেষ্ঠশক্তি জ্ঞানে আবহমানকাল পূজা করিয়া আসিতেছেন। মানবসমাজে, শুধু মানবসমাজে• বলি কেন, জীবজগতে ও উদ্ভিদজগতে সূর্য্যের কার্য্য-কারিতা বিচার করিলে, ফলপুষ্প-সমন্বিত, বিহঙ্গকাকলী-কূজিত, অসংখ্য জীবের বাসস্থান আনন্দময় আমাদের এই বসুন্ধরার সর্ব্বোন্নতি, সর্ব্বৈশ্বর্য্যের একমাত্র কারণ সূর্য্যকে পূজা না করিয়া থাকা যায় মা।

সূর্য্য দিনরাত্রি প্রভেদের হেতু, উত্তাপের আকর ও ঋতু পরিবর্ত্তনের কারণ। সূর্য্যকরে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত না হইলে উহা এমন কঠোর শৈত্যের আবাসস্থল হইত যে প্রাণী অথবা উদ্ভিদ কিছুই সজীব থাকিতে পারিত না। সূর্য্য কিরণ মেঘ, বৃষ্টি, বায়ু, বাত্যার

কারণ। সূর্য্যরশ্মিই উদ্ভিদ জাতির প্রাণ। চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয় বটে কিন্তু সূর্য্যালোকই দর্শন শক্তির প্রধান অবলম্বন।

আমাদের এই পৃথিবী হইতে সূর্য্যমণ্ডলকে একখানি উজ্জ্বল সুবর্ণ থালার ন্যায় দেখায়; বাস্তবিক উহার আকৃতি থালার মতও নহে বা অত ছোটও নহে। বর্ত্তুলাকার যে কোন দ্রব্য দূর হইতে থালার মতই দেখা যায়। তোমরা একটী ফুটবল, বাতাপিলেবু বা একটি বড় ভাঁটা লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। তোমরা আরও দেখিয়াছ যে কোন দ্রব্য বেশী দূর হইতে দেখিলে ছোট দেখায়। সূর্য্য দূরে—অতি দূরে আছে বলিয়া আমরা পৃথিবী হইতে তাহাকে একখানি থালার মত দেখি। ইহার আকৃতি, আয়তন ও দূরত্বের বিষয় শুনিলে বিস্ময়াবিষ্ট না হইয়া থাকা যায় না।

সূর্য্যও আমাদের পৃথিবীর ন্যায় বর্ত্তুলাকার। সূর্য্যের ব্যাস প্রায় ৮,৬৪০০০ মাইল এবং পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য প্রায় ১৩,৩১,০০০ গুণ বৃহৎ; অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর তুল্য ১৩ লক্ষ পৃথিবী সূর্য্যের গর্ভে অনায়াসে রাখা যাইতে পারে। একটী সরিষার সহিত একটী ছোট ফুটবল বা খুব বড় একটী বাতাপি লেবুর আয়তনের যে সম্বন্ধ, আমাদের এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর সহিত আমাদের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের হেতু অতি প্রকাণ্ড সূর্য্যেরও সেই সম্বন্ধ। এখন ধারণা কর সূর্য্য কত বড়।

সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা এত বড় বটে কিন্তু এত গাঢ় নহে, সুতরাং এত ভারীও নহে। আধুনিক পণ্ডিতগণ নানা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে পৃথিবীর সম-আয়তন সূর্য্যের একটী

গণ্ডের ওজন পৃথিবীর ওজনের পাঁচ ভাগের একভাগ মাত্র। অর্থাৎ সূর্য্য যদিও পৃথিবী অপেক্ষা ১৩,৩১,০০০ গুণ বড় কিন্তু ওজনে মাত্র ৩,৩২,০০০ গুণ ভারী।

সূর্য্যের দূরত্বও অসাধারণ! সূর্য্য পৃথিবী হইতে প্রায় ৯, ২৮,০০,০০০ মাইল দূরবর্ত্তী। দার্জ্জিলিঙ্গ মেল ট্রেণ ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে ধাবিত হয়। ইহাকে যদি সূর্য্যের অভিমুখে অহোরাত্র অবিশ্রান্ত গতিতে চালনা করা যায় তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠ হইতে সূর্য্যমণ্ডলে উপনীত হইতে ইহার প্রায় ২১৬ বৎসর লাগিবে। অথচ পৃথিবীর চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে ইহার ২১ দিনেরও কম সময় লাগে। উড়োজাহাজ অপেক্ষা দ্রুতগামী যান এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। উড়োজাহাজ দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত গতিতে চালাইয়া পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবি ব্যক্তিও সারা জীবনে সূর্য্যের সমীপস্থ হইতে পারে না।

সূর্য্যের আয়তন ও দূরত্বের সহিত তুলনায় চন্দ্র অতি ক্ষুদ্র ও আমাদের অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। চন্দ্র আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট, প্রায় ৫০ ভাগের একভাগ মাত্র এবং সূর্য্যের দূরত্বের ৪০০ ভাগের একভাগেরও কম দূরে। চন্দ্র পৃথিবী হইতে প্রায় ২৩৯০০০ মাইল দূরবর্ত্তী।

এইবার সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপের কথা কিছু বলিব। একজন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে একস্থানে যুগপৎ ৫৫৬০টী মোমবাতী প্রজ্জ্বলিত করিলে তাহার এক ফুট অন্তরে যে পরিমাণ আলোক প্রকাশিত হয়, পৃথিবীতে সরলভাবে পতিত সূর্য্যালোক সেই পরিমাণ উজ্জ্বল। আর সেই সূর্য্যরশ্মি যত উষ্ণ সূর্য্যদেহের

উষ্ণতা তাহার নবতিসহস্রগুণ অধিক। পৃথিবীস্থ যে কোন কঠিন পদার্থ সূর্য্য সমীপে নীত হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ বাষ্পে পরিণত হইয়া যায়।

পূর্ণিমা নিশিতে চন্দ্রমণ্ডল হইতে আমরা যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল মধুর আলোক প্রাপ্ত হই সৌরকরের উজ্জ্বলতা তাহার অপেক্ষা তিন লক্ষ গুণেরও অধিক।

উত্তম আতসী কাচ দ্বারা সূর্য্যরশ্মি সঙ্কুচিত করিয়া যে তাপ সংগৃহীত হয় তাহাতে কাষ্ঠখণ্ডাদি সহজেই প্রজ্জ্বলিত করা যায়। অত্যুৎকৃষ্ট আতসী কাচের সাহায্যে এত খরতর তাপের উদ্ভব হইতে পারে যে তাহাতে লৌহ, প্লাটিনাম প্রভৃতি কঠিন ধাতুদ্রব্য সকল দ্রবীভূত হইয়া যায়।

বায়ুরাশি ভেদ করিয়া সূর্য্য কিরণ পৃথিবীতে পতিত হয় ও ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে কিন্তু আসিবার কালে বায়ুরাশিকে উত্তপ্ত করিতে পারে না। উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সংসর্গে আসিয়া বায়ু কথঞ্চিৎ উষ্ণ হয়। এজন্য পৃথিবী-সংলগ্ন নীচের বায়ু অপেক্ষা উঁপরের বায়ু ও বাহিরের বায়ু অপেক্ষা গৃহাভ্যন্তরস্থ বা ছায়াযুক্ত স্থানের বায়ু শীতল। এই কারণেই অত্যুচ্চ পর্ব্বত বিষুবপ্রদেশে অবস্থিত হইলেও তাহার শিখরদেশ চিরতুহীনাবৃত থাকে। পণ্ডিতগণ বলেন যে ইহার কারণ বায়ু তাপ-অপরিচালক। বায়ুর এই গুণ না থাকিলে পৃথিবী মনুষ্যগণের বাসের অযোগ্য হইত।

আমরা দেখিতে পাই সূর্য্য প্রতিদিন পূর্ব্বদিকে উদিত হয় ও পশ্চিম দিকে অস্তগমন করে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। পৃথিবী অপেক্ষা আকারে সওয়া তের লক্ষ গুণেরও বড় এবং ভারে

সওয়া তিন লক্ষ গুণেরও বড় সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইবে ইহা কি সম্ভব ? বড় ষ্টীমারে বা রেলগাড়ীতে যাইতে যাইতে যখন আমরা নিবিষ্টচিত্তে জানালা দিয়া বাহিরের গাছপালা, পাহাড় পর্ব্বত দেখি তখন কি আমাদের মনে হয় না, আমরা স্থির হইয়া বসিয়া আছি আর তাহারা সকলে দ্রুতবেগে আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে ? পৃথিবীই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আবর্ত্তন করিতেছে বলিয়া এরূপ মনে হয়। পৃথিবী এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে অল্পে অল্পে সূর্য্যেরও চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতেছে। যেমন একটী লাট্টু ঘুরাইলে সেটী নিজে নিজে ঘুরিতে ঘুরিতে সরিয়া যায়—আমাদের পৃথিবীও সেই প্রকারে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় নিজে নিজে একবার ঘুরিয়া সরিতে সরিতে কিঞ্চিদধিক ৩৬৫ ঘণ্টায় সূর্য্যের চতুর্দ্দিক একবার প্রদক্ষিণ করে। ঘুরিবার সময় পৃথিবীর যে দিক সূর্য্যের দিকে থাকে, সেই দিক সূর্য্যালোকে আলোকিত অর্থাৎ দিন হয়—অপর দিক অন্ধকারে থাকে এবং তাহাকে আমরা রাত্রি বলি। ২৪ ঘণ্টায় দিবা ও রাত্রির সমবায়ে একটী পূর্ণ দিন হয় ও ৩৬৫ দিনে অর্থাৎ সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করার সময়ে আমরা বৎসর গণনা করি।

প্রশ্ন

১। "প্রভাকর সৃষ্টিকর্ত্তার অসীম শক্তির জ্বলন্ত চিহ্ন এবং অপার করুণার অপূর্ব্ব নিদর্শন" কেন ?—এই প্রবন্ধোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝাও।

২। সূর্য্যের গতি, তেজ ও দূরত্বের পরিমাণ বল ও তুলনা দ্বারা বুঝাও।

সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধের বর্ণনীয় বিষয়ঃ—কর্ম্মবীর সার আশুতোষের বহু কর্ম্মময় জীবন—কৃতকর্ম্মের সফলতা—তাঁহার কর্ম্মশক্তি, স্বাধীনচিত্ততা, ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ।

এই বিংশ শতাব্দীতে যে কয়টী বাঙ্গালী ভারতের বাহিরেও ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার অকাল-তিরোধানে বাঙ্গলার গৌরব-চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আশুতোষের অভাবে বাঙ্গলার তরুণগণ, বাঙ্গলার ছাত্র-সমাজ পিতৃহীন, অভিভাবকহীন হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আশুতোষ বাঙ্গলার কি ছিলেন, বাঙ্গলার জন্য, বাঙ্গালীর জন্য কি করিয়াছিলেন তাহা তোমাদের মত অল্প বয়স্ক ছাত্রগণের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত। তবে তাঁহার জীবন কত উন্নত, কত পবিত্র ও মহান্, কত কর্ম্মকঠোর ও অসাধ্যসাধনক্ষম ছিল তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস এই প্রবন্ধে দিব যাহাতে তোমরা বয়স ও জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত তাঁহার বিস্তৃত জীবন আলোচনা করিয়া তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে যশস্বী ও বরণীয় হইয়া মাতৃ-ভুমির মুখ উজ্জ্বল করিতে পার।

ভোগ-বিলাস সাধারণতঃ উন্নতি পথের অন্তরায়। বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের অধিকাংশই দরিদ্রের ঘরে, ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য্য হইতে দূরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ভোগ-বিলাস প্রতিবন্ধক বটে কিন্তু অনতিক্রমনীয় প্রতিবন্ধক নহে। আশুতোষের জীবনী

পাঠে এ কথাটিও তোমরা শিখিতে পারিবে। আশুতোষ ধনীর দুলাল, ভোগ-বিলাসের মধ্যে প্রতিপালিত ও পরিবর্দ্ধিত। কিন্তু শিক্ষা, সংযম, প্রতিভা ও কর্ম্মশক্তি প্রভাবে তিনি অসাধারণ কীর্ত্তিমান হইয়া অমর জীবন লাভ করিয়াছেন। ফলকথা, উন্নতি—জ্ঞানে, কর্ম্মে, অর্থে বা শক্তিতে, যে বিষয়েই হউক,—করিতে হইলে চাই শিক্ষা, চাই সাধনা, চাই শক্তি, চাই সংযম। এই গুণগুলি না থাকিলে উন্নতির আশা সুদূর পরাহত তাহা ধনীর গৃহেই হউক বা দরিদ্রের গৃহেই হউক।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন তারিখে, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃ-নিবাস হুগলী জেলার জিরাট বলাগড় গ্রামে। তাঁহার পিতা ৺গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লেখাপড়া শিখিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন এবং উত্তরকালে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ও বহু অর্থের অধিকারী হইয়া ভবানী-পুরে রসা রোডের উপর বর্ত্তমান বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে থাকেন। স্বাধীনচেতা, উন্নতমনা, বিদ্যানুরাগী, পিতা গঙ্গাপ্রসাদ পুত্রের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের জন্য সর্ব্বপ্রকারের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

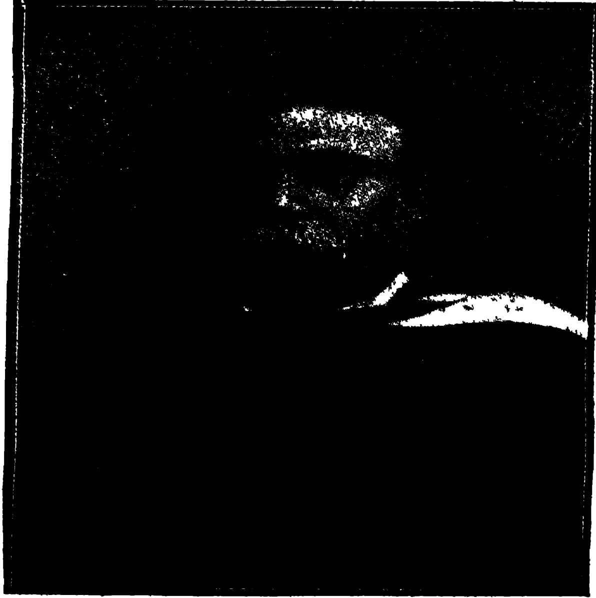
ছাত্রাবস্থায় অর্থাভাব এবং উপযুক্ত শিক্ষকের সাহচর্য্য ও সহযোগিতার অভাব অনেক সময় শিক্ষার্থীর মনোমত শিক্ষালাভের অন্তরায় হয়। ভাগ্যবান গঙ্গাপ্রসাদের ভাগ্যবান পুত্র আশুতোষকে কখনও অর্থ ক্লেশের জ্বালা সহ্য করিতে হয় নাই এবং ছাত্র-হিতপ্রাণ আদর্শ শিক্ষক মণ্ডলীর সাহায্য ও সহানুভূতির অভাবও তাঁহার সুদীর্ঘ ছাত্রজীবনে কখনও ঘটে নাই। উপযুক্ত শিক্ষক মণ্ডলীর

নিকট আশানুরূপ শিক্ষালাভ করিয়া আজন্ম বিদ্যানুরাগী আদর্শ ছাত্র আশুতোষ ইংরাজী, দর্শন, সংস্কৃত, বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। গণিতে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। বাল্যে সাউথ-সুবারবন স্কুলে হেড্ মাষ্টার বঙ্গবিশ্রুত ৺ শিবনাথ শাস্ত্রী ও গণিত-শিক্ষক গণিতজ্ঞ শ্যামাচরণ বসু মহাশয়দ্বয়ের উৎসাহে এবং কলেজে তাঁহার গণিতাধ্যাপক গণিত-বিদ্যাবিশারদ উইলিয়ম্ বুথ সাহেবের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্নে গণিতপ্রিয় আশুতোষ ভারতের মধ্যে গণিতশাস্ত্রে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন।

পাঠ্যাবস্থাতেই গণিতশাস্ত্রে তাঁহার লিখিত মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ সকল বিলাতের গণিত-বিষয়ক বিখ্যাত "মেসেঞ্জার অব ম্যাথেমেটিক্স্" পত্রে প্রকাশিত হইত। তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ ইউক্লিডের জ্যামিতির ১ম ভাগের পঞ্চবিংশ প্রতিজ্ঞার নূতন ধরণে প্রমাণ। এইটি তিনি ষোল বৎসর বয়সের সময় লিখিয়াছিলেন। মৌলিক গবেষণামূলক এই সকল প্রবন্ধ এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে তাহার মধ্যে দুইটী প্রবন্ধ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হয়; এবং পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়ের স্বতঃপ্রবৃত্ত সাহায্যে আশুতোষ লণ্ডনের রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটীর ও এডিন্‌বরার রয়েল সোসাইটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হন। পাঠ্যাবস্থা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে বিদেশীয় বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া এইরূপ গৌরবাত্মক উপাধি লাভ এখন পর্য্যন্ত কোন ভারতবাসীর ভাগ্যে ঘটে নাই।

আশুতোষ ১৮৭৯ অব্দে এন্ট্রান্স ও ১৮৮১ অব্দে এফ-এ,

পরীক্ষায় ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। দুই বারই পরীক্ষার পূর্ব্বে সাংঘাতিক পীড়ায় পীড়িত হওয়ায় সর্ব্বপ্রথম হইতে পারেন নাই। ১৮৮৪ সালে বি-এ, ১৮৮৫ সালে গণিতে এম-এ, এবং ১৮৮৬ সালে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া সকল



পরীক্ষাতেই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৬ সালে আশুতোষের এককালীন প্রেমচাঁদ বৃত্তি পরীক্ষা ও বিজ্ঞানে এম-এ পরীক্ষা দান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক অদ্ভুত ব্যাপার। তিনি উপর্য্যপরি ৭ দিন বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া তারপরই আবার ৬ দিন

বিজ্ঞানে, এম এ, পরীক্ষা দেন ও উভয় পরীক্ষাতেই অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। এ পর্য্যন্ত আর কোন ছাত্র এরূপ কল্পনাও করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। প্রেমচাঁদ বৃত্তির দশ হাজার টাকাই তিনি জ্ঞান ও গবেষণার জন্য উৎকৃষ্ট পুস্তক কিনিয়া ব্যয় করিয়াছিলেন। প্রেমচাঁদ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার পর বৎসরে তিনি একেবারে গণিতের এম-এ পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আর কোন বাঙ্গালী ইতিপূর্ব্বে ঐ দুরূহ শাস্ত্রে এম-এ, পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন নাই।

১৮৮৮ সালে সিটী কলেজ হইতে আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আশুতোষ অসাধারণ আইনজ্ঞ সার রাসবিহারীর "আর্টিকেল্‌ড্‌ ক্লার্ক" রূপে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। আইন পড়িবার কালেও তিনি অধুনা প্রিভিকাউন্সিলের জজ সৈয়দ আমীর আলী, লর্ড এস, পি, সিংহ ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়-গণকে শিক্ষকরূপে পাইয়াছিলেন।

তিনি ১৮৯৪ অব্দে ডি, এল উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৯৭ অব্দে ঠাকুর আইনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ব্যবহারজীবের ব্যবসায়েও আশুতোষের খ্যাতি প্রতিপত্তি বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। দেশ-বিদেশের আইন ও বিধি ব্যবস্থার জ্ঞান গুরু রাসবিহারীর ন্যায় তাঁহারও প্রগাঢ় ছিল। হাইকোর্টের বিচারপতির আসন হইতে অবসর গ্রহণ করিলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টায় ডুমরাঁও মহারাজের অতিদুরূহ ও জটীল আইন সংক্রান্ত মোকদ্দমার সমস্ত ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করেন। ইহা হইতেই ব্যবহারজীবী হিসাবে তাঁহার শক্তি ও প্রতিপত্তির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

১৮৯০ ও ১৮৯২ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে এবং ১৯০৩ অব্দে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষ হইতে তিনি বঙ্গীয় লাট সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। শেষোক্ত বৎসরে বাঙ্গলা-লাট-সভা হইতে তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে ভারতীয় লাট সভায় প্রেরিত হন। লর্ড কার্জ্জন নিযুক্ত ভারতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনে তিনি বাঙ্গলার প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং নিজ অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে লর্ড কার্জ্জনের সঙ্কল্পিত শিক্ষা সঙ্কোচ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া নিজ কর্ত্তৃত্বাধীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অচিন্তিত-পূর্ব্ব সম্প্রসারণ করিয়াছিলেন। ভারত-গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত ভারতীয় শিক্ষা-কমিশনেও (স্যাড্‌লার কমিশনেও) তিনি অতীব সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া কি স্বদেশী কি বিদেশী সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে আশুতোষ হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ১৯ বৎসরকাল বিচারপতির কঠোর কর্ত্তব্য অতি সুচারুরূপে এবং প্রশংসার সহিত সম্পন্ন করিয়া ১৯২৩ অব্দের ডিসেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি দুইবার অস্থায়ী ভাবে প্রধান বিচারপতির কার্য্যও করিয়াছিলেন। বিচারপতিরূপে সার আশুতোষ স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্য, ব্যবহারশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, আইনের কূটনীতি বিশ্লেষণে অপূর্ব্ব দক্ষতা এবং সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে শত্রু মিত্র সকলেরই শ্রদ্ধাভক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিবার অল্পকাল পরেই তিনি মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান তিনি কিশোর বয়সে,

বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য তাঁহার খুল্লতাত রাধিকাপ্রসাদ বাবুর সংসর্গে থাকিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি বিধানে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কখনও সিণ্ডিকেটের মেম্বররূপে কখনও বা ভাইস্‌চ্যান্সেলররূপে তিনি একাদিক্রমে ছত্রিশ বৎসর নিজ জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের কঠোর পরিশ্রমের পর বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে আসিয়া রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত তথাকার সকল বিভাগের কার্য্য তিনি পরিদর্শন করিতেন। ১৯০৬ অব্দে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর পদে নিযুক্ত হন এবং পর পর ক্রমাগত ৮ বৎসর কাল ঐ পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার পরের ছয় বৎসর কাল, সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, প্রধান বিচারপতি স্যাণ্ডারসন ও সার নীলরতন সরকার ভাইস্ চ্যান্সেলর থাকিলেও কার্য্যতঃ সকল ক্ষমতাই তাঁহার হস্তে ছিল, ও সকল বিষয়েই তাঁহার নির্দ্দেশমত কার্য্য হইত। পুনরায় ১৯২১ অব্দে তিনি ঐ পদে বরিত হন। তৎপরে তদানীন্তন চ্যান্সেলর লাট লিটনের সহিত মতানৈক্য হওয়ায় তিনি পুনর্ব্বার ঐ পদ গ্রহণে অসম্মত হয়েন।

আশুতোষ নবগঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারই অস্থি-মেদ-মজ্জা দিয়া যেন বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে স্তরে গড়িয়া উঠিতেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিশেষত্বটী তাঁহার অপূর্ব্ব মনীষা ও কর্ম্ম-সাফল্যের নিদর্শন।

অর্থ পাইলে, সরকারী সাহায্য ও সহানুভূতি পাইলে অনেকে

অনেক কার্য্য করিতে পারেন। তাহাতে কর্ম্মশক্তির পরিচয় থাকিলেও বিশেষত্বের পরিচয় নাই। আশুতোষ শূন্য হস্তে, একপ্রকার বিনা সরকারী সাহায্যে, প্রতিকূল শক্তির সহিত অনবরত যুদ্ধ করিয়া যে বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা জগতের শিক্ষার ইতিহাসেও দুর্লভ। তাঁহারই ব্যক্তিত্ব প্রভাবে ও কর্ম্মকুশলতায় প্রাতঃস্মরণীয় ধনকুবের রাসবিহারী ঘোষ ও তারকনাথ পালিতের সঞ্চিত অর্থ দেশে উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার ও দেশবাসীর দ্বারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্য্যের অনুষ্ঠানকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ন্যস্ত হয়। পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র পরীক্ষা-কেন্দ্র ও পরীক্ষক-সমাজরূপে কার্য্য করিত। আশুতোষের প্রাণপাত পরিশ্রমে ও তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা-পরিকল্পনা ও কর্ম্ম-কুশলতা বলে ইহা অধুনা ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এখন জগদ্বরেণ্য বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির পার্শ্বে স্থান পাইবার উপযুক্ত।

তাঁহাদের প্রদত্ত প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আশুতোষ তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি, কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবাসীর তত্ত্বাবধানে ভারতবাসীর উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষা ও স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ফলে বিজ্ঞান কলেজের গবেষণা মন্দিরে আবিষ্কৃত অভিনব বৈজ্ঞানিক তথ্যে বঙ্গবাসী ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জগতে অতি উচ্চস্থান অধিকারে সমর্থ হইয়াছে।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারেও তাঁহার কৃতিত্ব অতুলনীয়।

সংখ্যক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপনে সাহায্য করিয়া তিনি জনসাধারণের মধ্যে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালাভে আগ্রহ ও চেষ্টা কল্পনাতীতরূপে বৰ্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন।

তাঁহার আর একটী অক্ষয় কীর্ত্তি বাঙ্গলা ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনীয় বিষয়গুলির মধ্যে বাঙ্গলা সাহিত্যের কোন স্থান ছিল না। বাঙ্গলা সাহিত্যকে সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহারই যত্নে ও চেষ্টায় এখন ম্যাট্রিকুলেশন হইতে এম, এ, পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই বাঙ্গলা সাহিত্যের স্থান নির্দ্দেশ হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষাকেই শিক্ষার বাহন করিবার কল্পনা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতেন। এত বিপুল কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও আশুতোষ মাতৃ-ভাষার সেবায় উদাসীন ছিলেন না। দুইবার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিরূপে ও কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে প্রদত্ত সারগর্ভ অভিভাষণ হইতে তাঁহার মাতৃ-ভাষার প্রতি আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বরে বা পারিপাট্যে আশুতোষের স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ছিল। ধনীর দুলাল হইলেও তিনি বাল্যকাল হইতে অতি সাদাসিধা পোষাক পরিতেন ও অতি সাধারণ চাল-চলনে থাকিতেন। হাইকোর্ট ও লাট-সভা ব্যতীত তাঁহার বিপুল বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে সাদা ধুতি ও সাদা জিনের কোটই তাঁহার পোষাক ছিল। বাটীতে বেশীর ভাগ সময়ে তিনি খালি গায়ে থাকিতেন এবং খালি গায়ে কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। একবার ছোটলাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজার মহোদয় তাঁহার বাটীতে আসিলে সার আশুতোষ তাঁহার সহিতও

খালি গায়ে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ছোটলাট হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"আপনার সাদাসিধা ভাব দেখিলে আমার হিংসা হয়। জানি না কতখানি মনের বল থাকিলে এরূপ হওয়া যায়।

আশুতোষ হিন্দু ছিলেন, বাঙ্গালী ছিলেন, ব্রাহ্মণ ছিলেন। এ তিনের গৌরব তিনি আজীবন অটলোন্নতশিরে বহন করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় সম্রাট ৫ম জর্জ্জের সহিত ভোজের নিমন্ত্রণ গ্রহণে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

আশুতোষ বিরাট পুরুষ ছিলেন। তাঁহার হৃদয় বিরাট, তাঁহার আশ্রিত বাৎসল্য বিরাট, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি বিরাট, তাঁহার প্রতিভা-পরিকল্পনা বিরাট,—আর বিরাট ছিল তাঁহার প্রভুবুদ্ধি ও স্বাধীনচিত্ততা। য়ুরোপ বা আমেরিকায় হইলে তিনি রাষ্ট্রপতি বা মহামন্ত্রী হইতে পারিতেন। বাঙ্গলার এই বিরাট পুরুষ ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে প্রবাসে পাটনা সহরে হঠাৎ তিন দিনের অসুখে তাঁহার স্বজাতি ও স্বদেশকে গভীর শোক-সাগরে ভাসাইয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। আমরাও পুণ্যচরিত বাঙ্গলার এই আদর্শ বিরাট পুরুষকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করি।

প্রশ্ন

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষের প্রাণস্বরূপ ছিল; এই প্রবন্ধোক্ত বর্ণনা হইতে তাহা সপ্রমাণ কর।

২। আশুতোষের সংক্ষিপ্ত ছাত্র জীবন বর্ণন কর।

সমাপ্ত।

সূচীপত্র

কবিতাপাঠ

——:০:——

তৃতীয় ভাগ

প্রথম খণ্ড

ঈশ্বর

বর্ণনীয় বিষয়ঃ—ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন। প্রকৃতির সকল কার্য্যেই ভগবৎমহিমার জ্বলন্ত নিদর্শন সকল দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবানে আত্ম সমর্পণ।

জগদীশ!—

এ ভব-ভবন-মাঝে
যে দিকে যখন চাই,
তোমার করুণারাশি
কেবলি দেখিতে পাই।

তোমার আদেশে রবি
উজ্জ্বল-কিরণময়,
তোমার আদেশে বায়ু
ভুবন ভরিয়ে রয়।

১ চাঁদের মধুর আলো
যখন জগতে ভাসে,
তোমার করুণা তায়
উছলি উছলি হাসে।

২ আঁধার গগনে যবে
কোটি তারা দেয় দেখা,
তোমার মহিমা যেন
জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা।

৩ বিহগে ললিত গীতি
শিখায়েছ ভালবাসি,
ঢেলেছ ফুলের দলে
স্বরগের শোভা রাশি।

৪ ভূধর, সাগর, মেঘ,
বসন্ত, বরিষ-ধারা,
বিচিত্র কৌশল তব
মরমে জাগায় তা'রা।

৫ নগরের কোলাহল
বিজনের নীরবতা,
না সুধিতে বলে সদা
তোমারি স্নেহের কথা

কত যে বাসিছ ভাল
কিছু না জানিতে পাই
যখন যা প্রয়োজন
তখনি দিতেছ তাই।

ভাঙ্গিলে ভবের খেলা,
কোল পেতে দিবে স্থান,
দেখেও দেখিনে, তবু
নাহি ভাব "কু-সন্তান"।

নাহি চাও প্রতিদান,
নাহি রাখ কোন আশা,
নীরবে বাসিছ ভাল
ধন্য বটে ভালবাসা।

কি আর চাহিব নাথ
তোমার চরণতলে,
তুমি যার সে আবার
কি চাহিবে ভূমণ্ডলে?

এই মাত্র মাগি ভিক্ষা
যে ভাবে যখন থাকি,
তুমিই আমার, তাই
সদা যেন মনে রাখি।

যতটুকু যত বিন্দু,
যা হয় এ ক্ষমতায,
সাধিয়া তোমার কাজ
যেন এ জীবন যায়।

ধবম, করম-ফল
সকলি তোমার হরি।
ভকতি প্রণতি নাথ!
ধর, এ মিনতি করি।

প্রশ্ন

১। এই কবিতার সাব মর্ম্ম নিজ ভাষায লিখ।
২। কবিতাটি মুখস্থ বল।

শ্রাবণে

বর্ণনীয় বিষয়ঃ—বর্ষাবহুল বাঙ্গলা দেশের শ্রাবণ মাসেব একটি দিনেব বর্ণনা।

(১)

সারাদিন একখানি জল-ভরা শ্রান্ত মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ;
বসিয়া গবাক্ষ ধারে সারাদিন আছি চেয়ে,
জীবনের আজি অবকাশ।

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, তরুগুলি হেলে দোলে,
ফুলগুলি পড়িছে খসিয়া ;
লতাদের মাতাগুলি মাটীতে পড়িছে ঝুলি,
পাখীগুলি ভিজিছে বসিয়া।
কোথা সাড়া শব্দ নাই, পথে লোকজন নাই,
হেথা হোথা দাঁড়ায়েছে জল ;
ভিজে মাঠ বন হ'তে ফড়িং লাফায়ে ওঠে,
জলায় ডাকিছে ভেক দল।
চাতক ঝাড়িয়া পাখা, ডাকিয়া ফটিক জল,
বেড়াতেছে উড়িয়া আকাশে ;
কদম্ব কেতকী বাস কম্পিত বাতাসে ভাসে :
ঢাকা ধরা শ্যাম কুশ কাশে।

(২)

দীঘিটি গিয়াছে ভ'রে সিঁড়িটি গিয়াছে ডুবে,
কাণায় কাণায় কাঁপে জল
বৃষ্টি-ঘায় বায়ু-ঘায় পড়িতেছে নুয়ে নুয়ে
আধ-ফোটা কুমুদ কমল।
তীর-নারিকেল-মূলে থল্ থল্ করে জল,
ডাহুক ডাহুকী কূলে ডাকে ;
শ্রেণী দিয়া মরালীরা ভাসিছে তুলিয়া গ্রীবা,
লুকাইছে কভু দাম ঝাঁকে।
পাড়ে পাড়ে চকাচকী ব'সে আছে দুটি দুটি
বলাকা মেঘের কোলে ভাসে ;

ক্বচিৎ বা গ্রাম্য বধূ শূন্য কুম্ভ ল'য়ে কাঁখে
তরু-শ্রেণী তল দিয়া আসে।
ক্বচিৎ অশ্বথ-তলে ভিজিছে একটি গাভী ;
টোকা মাথে যায় কোন চাষী ;
ক্বচিৎ মেঘের কোলে মুমূর্ষুর হাসি সম
চমকিছে বিজলীর হাসি।

(৩)

মাঠে নবশ্যাম ক্ষেতে কচি ধান গাছগুলি
মাথাগুলি জাগাইয়া আছে।
কোলেতে লুটিছে জল টল্ মল্ থল্ থল্
বুকে বায়ু থর থর নাচে।
সুদূরে মাঠের শেষে জ'মে আছে অন্ধকার,
কোথা যেন হ'তেছে প্রলয় !
ঘরে ব'সে মুড়ি দিয়া গৃহস্থ স্ত্রী-পুত্র সহ
কত দুর্য্যোগের কথা কয়।
(চেয়ে আছি শূন্য পানে কোন কাজ হাতে নাই,
কোন কাজে নাহি বসে মন ;
তন্দ্রা আছে নিদ্রা নাই ; দেহ আছে মন নাই ;
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন।)

প্রশ্ন

। কবির বর্ণনা অনুযায়ী শ্রাবণের দিন বর্ণনা কর।
। (১) ও (২) চিহ্নিত চরণ দুটীর ব্যাখ্যা কর।

জীবন-সঙ্গীত

বর্ণনীয় বিষয় :—মানব-জীবন অসার ও অনিত্যময়,—ইহা বৃথা অপব্যয় করা উচিত নয়—যত দিন জীবন তত দিন দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া কার্য্য করা উচিত। প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণ শুধু কর্ম্মের দ্বারা অমর জীবন লাভ করিয়াছেন।

ব'ল না কাতর স্বরে "বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন,
দারা পুত্র, পরিবার, তুমি কার, কে তোমার"
ব'লে জীব কর না ক্রন্দন।
মানব-জনম সার, এমন পাবে না আর,
বাহ্য দৃশ্যে ভুলো না রে মন।
কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়,
ওহে জীব কর আকিঞ্চন।
ক'র না সুখের আশ, প'র না দুখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়;
সংসারে সংসারী সাজ, করো নিত্য নিজ কাজ
ভবের উন্নতি যাতে হয়।
যায়, ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির।
সহায়, সম্পদ, বল, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন পদ্মপত্র-নীর।

সংসার সমরাঙ্গনে, যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে,
ভয়ে ভীত হয়ো না মানব ;
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান্, যায় যাবে যা'ক্ প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্ল্লভ।
মনোহর মূর্ত্তি হেরে ওহে জীব অন্ধকারে,
ভবিষ্যতে করো না নির্ভর।
অতীত সুখের দিনে, পুনঃ আর ডেকে এনে
চিন্তা ক'রে না হ'ও কাতর।
সাধিতে আপন ব্রত, স্বীয় কার্য্যে হও রত,
এক মনে ডাক ভগবান।
সঙ্কল্প সাধন হবে ধরাতলে কীর্ত্তি রবে,
সময়ের সার বর্ত্তমান।
মহাজ্ঞানী, মহাজন যে পথে ক'রে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে, স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধরে,
আমরাও হব বরণীয়।
সময়-সাগর তীরে পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে,
আমরাও হব হে অমর ;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে, অন্য কোন জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
ক'রো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার-সমরাঙ্গন মাঝে,

সঙ্কল্প করেছ যাহা সাধন করহ তাহা,
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

প্রশ্ন

১। কবিতাটি মুখস্থ বল।
২। (১), (২) ও (৩) চিহ্নিত শ্লোক কয়টি ব্যাখ্যা কর।

দেবতা-বিদায়

বর্ণনীয় বিষয় :—দরিদ্রের সেবা করিলে ভগবানের সেবা করা হয়। ভগবান দরিদ্রের বেশে ভক্তের ভক্তি পরীক্ষা করেন।

দেবতা-মন্দির মাঝে ভকত-প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।
হেন কালে সন্ধ্যাবেলা ধূলি-মাখা দেহে
বস্ত্র-হীন জীর্ণ-দীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতর কণ্ঠে, "গৃহ মোর নাই,
এক পাশে দয়া ক'রে দেহ মোরে ঠাঁই।"
সসঙ্কোচে ভক্তবর কহিলেন তারে,
"আরে আরে অপবিত্র, দূর হ'য়ে যারে।"
সে কহিল, "চলিলাম"—চক্ষের নিমিষে
ভিখারী ধরিল মূর্ত্তি দেবতার বেশে।

ভক্ত কহে, "প্রভু, মোরে কি ছল ছলিলে !"
দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি' দিলে।
জগতে দরিদ্র-রূপে ফিরি দয়া তরে,
গৃহ হীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

প্রশ্ন

এই কবিতার সার মর্ম্ম নিজ ভাষায় লিখ।

কাঙ্গালিনী

বর্ণনীয় বিষয় :—এক দুর্গা পূজার দিনে আনন্দ-উৎসব মুখরিত কোন এক ধনীর গৃহাগত অনাথা কাঙ্গালিনী মেয়ের মনোভাব বর্ণন।

আনন্দময়ীর আগমনে,
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙ্গালিনী মেয়ে।
উৎসবের হাসি কোলাহল
শুনিতে পেয়েছে ভোর বেলা,
নিরানন্দ গৃহ তেয়াগিয়া,
তাই আজ বাহির হইয়া
আসিয়াছে ধনীর দুয়ারে
দেখিবারে আনন্দের খেলা।

বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী,
কাণে তাই পশিতেছে আসি'
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন ;
চারিদিকে প্রভাতের আলো,
নয়নে লেগেছে বড় ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক-তপন।
কত কে যে আসে, কত যায়,
কেহ হাসে, কেহ গান গায় ;
কত বরণের বেশভূষা—
ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন ;
কত পরিজন দাস দাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,
চোখের উপর পড়িতেছে
মরীচিকা-ছবির মতন
হের তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙ্গালিনী মেয়ে।
শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মা'র মায়া পায়নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে :

তাই বুঝি আঁখি ছল ছল,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা।
চেয়ে যেন মা'র মুখপানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে,—"মা গো, এ কেমন ধারা ?"
এত বাঁশী এত হাসিরাশি,
এত তোর রতন-ভুষণ,
তুমি যদি আমার জননী,
মোর কেন মলিন বসন ?"
ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলি
ভাই বোন্ করি' গলাগলি,
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই ;
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে,
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিঃশ্বাস ফেলিয়ে,
"আমি ত ওদের কেহ নই ;
স্নেহ ক'রে আমার জননী ;
পরা'য়ে ত দেয়নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে ক'রে নিয়ে
মুছায়ে ত দেয়নি নয়ন।"
আপনার ভাই নেই বলে'
ওরে কিরে ডাকিবে না কেহ !

আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কিরে করিবে না স্নেহ
ও কি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙ্গালিনী মেয়ে !
তার প্রাণ আঁধার যখন
করুণ শুনায় বড় বাঁশী,
দুয়ারেতে সজল নয়ন
এ বড় নিষ্ঠুর হাসি রাশি।
আজি এই উৎসবের দিনে
কত লোক ফেলে অশ্রুধার
গেহ নেই, স্নেহ নেই, আহা,
সংসারেতে কেহ নাই তার।
শূন্য হাতে গৃহে যায় কেহ
ছেলেরা ছুটিয়া আসে কাছে,
কি দিবে কিছুই নেই তার
চোখে শুধু অশ্রুজল আছে
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা, আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজি কিসের উৎসব ?
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লান মুখ বিষাদে বিরস,—

তবে মিছে সহকার-শাখা

তবে মিছে মঙ্গল-কলস।

প্রশ্ন

১। এই কবিতার সার মর্ম্ম কি ?

২। দুরাশার সুখের স্বপন, শরতের কনক-তপন, মরীচিকা ছবির মতন, শূন্যমনা কাঙ্গালিনী মেয়ে, মিছে তবে মঙ্গল কলস— এই পদ কয়টির ব্যাখ্যা কর।

৩। কবিতাটি মুখস্থ বল।

ধনবান্

বর্ণনীয় বিষয় ঃ—জগতে অর্থের কার্য্যকারিতা—অর্থের সদ্ব্যবহারের ফল—অর্থের অপব্যবহারে কি হয়।

ধনবান জনবান্ ধরণীর ফুল,
বিনা ধনী কে অবনী সাজাত এমন ?
কে পরাত ধরা-অঙ্গে এত আভরণ,
প্রাসাদ-মন্দির-মালা- স্বরগে অতুল ?

কাশ্মীর ভূধর-শিরে যক্ষ সরোবর
অচ্ছোদ যাহার নাম, কাদম্বরী প্রিয়,
কে সেখানে বিরচিত ক্রীড়াবন স্বীয়,
ধনী যদি না থাকিত পৃথিবী ভিতর।

3 তাজ্ অট্টালিকা চখে কে দেখিত আজ,
যার শোভা দেখিবারে ধরাপ্রান্ত হ'তে,
প্রতিদিন কত লোক আসে এ ভাবতে
অমূল্য প্রাসাদ রত্ন অবনীর মাঝ।

4 বিনা ধনী সুখকর শিল্পের প্রবাহ,
থাকিত না ধরাতলে বিদ্যার আহ্লাদ,
জানিত না নর-চিত্ত সাহিত্য আস্বাদ,
কি আনন্দকর চিত্ত সুখে অবগাহ।

5 উজ্জ্বল ধরণী অঙ্গ ধনীর উদয়ে,
রবি-ছটা সম-ছটা তাদের প্রকাশে,
একজন ধনী যদি হয় কোন দেশে,
চিব দীপ্ত সে অঞ্চল তার দীপ্তি লয়ে।

6 কোন্ কালে ছিল আগে ভারতমণ্ডলে
ভবানী অহল্যাবাই মহিলা দু'জন,
আজ (ও) দেখ তাহাদের নামের কিবণ ;
জাগায়ে স্বদেশ খ্যাতি জগতে উজ্জ্বল।

7 কত হেন লব নাম প্রতি দেশে দেশে,
ধনবতী ধনবান্ স্বদেশ-কল্যাণ
সাধন করিয়া নিত্য লভিয়া সম্মান,
স্বনাম স্বদেশ পূর্ণ করিছে সুযশে।

8 সাধিতে জগৎ-হিত ধনীর সৃজন,
বিধাতা তাদের হস্তে দিয়াছেন ধন ;

জগতের সুমঙ্গল করিয়া মনন,
এ কথা যে বুঝে মর্ত্ত্যে দেবতা সে জন ।

৭ নিত্য স্মরণীয় সেই মহাত্মা ভূতলে,
কত দুঃখ প্রাণি-জ্বালা করে নিবারণ,
জগতের কত হিত করে সে সাধন,
সে কথা ভাবিলে প্রাণ আপনি উথলে ।

10. পরের হিতার্থে ধন না বুঝে যে ধনী,
নিজ স্বার্থ চরিতার্থ সদা বাঞ্ছা করে,
পরহিত ভাবে না যে মুহূর্ত্তের তরে,
সে জন দুরাত্মা অতি জগতের গ্লানি ।

11. বিধাতার বর-পুত্র ধনী এ ধরাতে
দেবতা হইতে পারে ইচ্ছা যদি করে,
ইচ্ছা ক'রে যেতে পারে নরক ভিতরে
স্বর্গ নরকের দ্বার তাহাদের হাতে ।

12 ধনীরাই সংসারের সুখ দুঃখ মূল,
যে ধনী না বুঝে ইহা ভ্রান্ত পথে যায়
ধরার কণ্টক সেই ; যে বুঝে ইহায়,
ফুটে রয় ভবময় শোভায় অতুল ।—
ধনবান্ জনবান্ ধরণীর ফুল ।

প্রশ্ন

২ । এই কবিতার সার মর্ম্ম লিখ ।

২ । (১), (২) ও (৩) চিহ্নিত শ্লোক কয়টীর ব্যাখ্যা কর

কবি-পূজা

বর্ণনীয় বিষয় :—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা ।

1. কুবেরের রাজ্য ছাড়ি' উত্তরে যাদের বাড়ী
তোমারে পূজিল তারা স্বর্ণ-চম্পাদলে ;



বাল্মীকির সরস্বতী লভিলেন নব জ্যোতি
হে কবি : তোমার পুণ্যে পুনঃ পৃথ্বীতলে ।

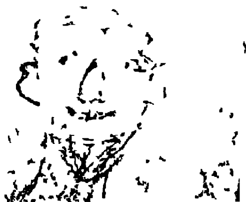
দুনিয়ার জ্ঞানী গুণী মুগ্ধ তব বীণা শুনি,
আজি বিশ্ব-গুণী-গণে গণনা তোমার,
উজলিয়া মাতৃ-ভূমি আজি উজলিছ তুমি;
জগতের যতনের নব রত্নহার।

এ হার টুটিবে যবে একাল সেকাল হবে,
লুকাবে জ্যোতিষ্ক বহু বিস্মৃতি-আঁধারে,
তুমি রবে অবিচল সূর্য্যকান্তি সমোজ্জ্বল
অনন্ত কালের কণ্ঠে বৈজয়ন্তী-হারে।

বাণী তব বিশ্ব-ছায় কুবেরেরও পূজা পায়,
পূজা পায় পুষ্পলাবী রতন-কাঞ্চন,
তারি সঙ্গে অনুক্ষণ মোরা করি নিবেদন
অনুরক্ত হৃদয়ের আরক্ত চন্দন।

প্রশ্ন

১। কবির জীবনের কোন্ ঘটনাটী এই কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে?



পুরুরাজ ও আলেক্‌জাণ্ডার

বর্ণনীয় বিষয়ঃ—মাসিদনপতি পুরুরাজ বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডার ও বন্দী পুরুরাজের আকৃতি, প্রকৃতি ও পরস্পরের প্রতি ব্যবহার বর্ণন ;—এবং তদুপলক্ষে মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের মহত্ত্ব কথন।

বাজসভা মাঝে মাসিদন-পতি—
সমাসীন সিকন্দর।
ঘিরি নরনাথে বীতিহোত্র-রূপী
শত শত বীরবর॥
মুকুতা-খচিত শ্বেতচ্ছত্র চারু
শোভা পায় রাজশিরে।
সুবেশ-কিঙ্কর দাঁড়াইয়া পাশে
চামর ঢুলায় ধীরে॥
বীর-গর্ব্বে ভরা উজ্জ্বল বদন,
নয়নে জ্যোতির ভাস।
যৌবনের স্ফূর্ত্তি উথলিত দেহে,
অধরে মধুর হাস॥
মহিমা-মণ্ডিত প্রশস্ত ললাটে
অঙ্কিত প্রতিভা-রেখা।
"রাজরাজেশ্বর" বিধাতার লিপি
যেন সেথা আছে লেখা॥

পাত্র, মিত্র যত, দাঁড়ায়ে সম্মুখে,
দূরে ফিরে রক্ষিদল।
নীরব-গম্ভীর সবাব বদন,
স্তব্ধ বাজ-সভাতল॥
সহসা অদূরে শৃঙ্খলের ধ্বনি,
অস্ত্র-ঝনৎকাব সনে।
বীর পদক্ষেপে কাঁপাইয়া সভা
চমকিল সর্ব্বজনে॥
বন্দী পুরুবাজে ল'য়ে রক্ষিদল
প্রবেশিল সভামাঝে।
ব্যাধগণ মিলি আনিল বাঁধিয়া
যেন মত্ত মৃগবাজে॥
বিশাল উরস্, দীর্ঘ ভুজযুগ,
শালপাংশু মহাকায়।
আপন জ্যোতিতে আপনি উজ্জ্বল
নবোদিত রবি প্রায়॥
মণিবন্ধে বাঁধা লোহার শৃঙ্খল,
লোহার শৃঙ্খল গলে।
তবু মহিমায় উজ্জ্বল বদন
নেত্রে অগ্নিশিখা জ্বলে॥
হেরি সে মূরতি সভাজন যত,
চমকি মুহূর্ত্ত তরে,

আপনা পাসরি, শির নোয়াইয়া
নমিলা সম্ভ্রম-ভরে ॥
নিজে সিকন্দর নিমেষের তরে
চমকিলা সিংহাসনে।
প্রসারিয়া কর অভ্যর্থিতে তাঁয়
বাসনা হইল মনে ॥
শালতরু প্রায়. উচ্চ করি শির,
দাঁড়াইলা বীরবর।
অনিমেষ আঁখি নিরখি সে ঠাম,
মুগ্ধ বীর সিকন্দর ॥
সভাসদ এক পুরুরাজ-পাশে
আসিয়া কহিলা তাঁয়,
“একি ব্যবহার ? হও নতজানু,
বন্দী তুমি এবে, রায়” !
নীরবে বীরেন্দ্র কটাক্ষে কেবল
চাহিল তাহার পানে।
বোধ হ'ল তার মর্ম্মদেশ কেহ
বিঁধিল বিষাক্ত বাণে ॥
মধুর বচনে পুরুরাজে তবে
সম্বোধিয়া সিকন্দর
কহিলেন, “আমি সাহসে তোমার
পরিতুষ্ট বীরবর !

যে বীরত্ব তুমি দেখায়েছ রণে
নাহিক তুলনা তার !
কহ কি বাসনা ? গুণ-যোগ্য তব
দিব আজি পুরস্কার ॥
ধন, জন, মান কিবা প্রয়োজন ?
লহ যাহা ইচ্ছা হয় ।
রাজ্য চাহ যদি দিব তোমা বীর !
ভারত করিয়া জয় ।
বীরের সম্মান বীর না রাখিলে,
কে রাখিবে তবে আর ?
তব বীরপণা অতুল জগতে
দিব যোগ্য পুরস্কার ॥"
কহিলা নরেন্দ্র, "ভাগ্যবান্ তুমি,
মহাবীর সিকন্দর !
কিন্তু পুরুরাজ প্রতিদ্বন্দ্বী তব,
ভুলিও না বীরবর !
আশ্রিত যে জন, তব কার্য্যতরে
করিয়াছে রক্ত দান ।
যোগ্য পুরস্কার বিতরি তা' সবে
বাড়াও তাদের মান ॥
কৃপার ভিখারী নহি আমি তব,
নাহি চাহি ধন মান ॥

জন্ম ক্ষত্রকুলে সাধি ক্ষাত্রধর্ম্ম,
আনন্দে ত্যজিব প্রাণ।”
লজ্জিত বীরেন্দ্র, কহিলা সম্ভ্রমে,
“কহ মোরে নররাজ।
কি বাসনা তব ? কোন্ কার্য্য সাধি
তুষিব তোমারে আজ” ?
কহিলা পৌরব, “তুষিতে আমারে
বাসনা যদ্যপি মনে।
প্রচার আদেশ লুণ্ঠন হইতে
নিবারহ সেনাগণে ॥
গো, ব্রাহ্মণ, নারী রক্ষা কর বীর !
রক্ষ যত দেবালয়।
বীরশ্রেষ্ঠ তুমি দেখাও জগতে
বীর কভু দস্যু নয় ॥
কাপুরুষই যেই অনাথ দুর্ব্বলে
করে সেই অত্যাচার।
কিন্তু, আর্ত্তজনে অভয় প্রদান
বীরের ধরম সার ॥”
“তথাস্তু, নৃমণি !” কহিলা বীরেন্দ্র,
“বাসনা হ’বে পূরণ।
সেনাগণ মম তব রাজ্যে কেহ
না করিবে উৎপীড়ন ॥

কিন্তু বীরবর ! সুধাই তোমাবে
বল মোরে একবার ।
মহত্ত্বের তব, উপযুক্ত আমি
কি করিব ব্যবহার ॥”
নীরবি ক্ষণেক কহিলা রাজেন্দ্র,
“এই মোর নিবেদন ।
রাজা আমি, বীর ! কর মোর প্রতি
রাজ-যোগ্য আচরণ ।”
শুনি সিকন্দর সিংহাসন হ’তে
নামিয়া সম্ভ্রম ভরে ।
পুরুরাজ-পাশে গিয়া পাশ তাঁর
খুলিলা আপন করে ॥
করে কর ধরি’, অতি সমাদরে
বসাইয়া নিজাসনে ।
সভাজন যত, চিত্রার্পিত প্রায়,
নেহারয়ে দুই জনে ॥
মুগ্ধ পুরুরাজ, অশ্রুপূর্ণ আঁখি
গদ গদ কণ্ঠস্বর ।
কহে,“সত্য আজি পরাজিলে মোরে,
মাসিদন-অধীশ্বর” ।
শত কণ্ঠ হ’তে উঠিল অমনি
“ধন্য ধন্য—জয় জয় !

(তোমাদের যোগ্য তোমরা কেবল
নাহি তুল্য বিশ্বময় ॥”)
“ধন্য সিকন্দর” ! ‘ধন্য পুরুরাজ !
গাইল চারণ দল।
যুগ-যুগান্তর তোমাদের যশ
ঘোষিবে অবনীতল ॥
“ধন্য পুরুরাজ” ! গায় আজ কবি,
ভারত-সন্ততিসার।
“পরাজয়ে জয়ী তুমি বীরম‍
তুল্য তব নাহি আর।”

প্রশ্ন

১। কবির বর্ণনা অনুসারে আলেক্‌জাণ্ডারের মহত্ত্ব বর্ণনা কর।

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অর্থ লিখ ও পদ পরিচয় দাও।—বীতিহোত্ররূপী, জ্যোতির ভাস, মত্ত মৃগরাজে, শালপ্রাংশু, অভ্যর্থিতে, মর্ম্মদেশ, প্রতিদ্বন্দ্বী, আর্ত্তজনে।



চণ্ডালী

প্রতিপাদ্য ও বর্ণনীয় বিষয়ঃ—ভক্তের ভগবান, গৃহ হইতে শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী পুরীধামে জগন্নাথ দেবকে রথোপরি দর্শনাশায় গমনকারী এক বৃদ্ধ, খঞ্জ, ভক্ত চণ্ডালিনীর কাহিনী বর্ণন।

বৃদ্ধ খঞ্জ চণ্ডালী এক
শ্রীমুখ দেখিতে রথে,
একাকিনী যায় চলে ধীরি ধীরি
মেদিনীপুরের পথে।
দিবসে যে শুধু হাঁটে এক ক্রোশ
তাহার একি গো দায়,
গৃহ হ'তে দূর এক শত ক্রোশ
পুরীধাম যেতে চায়।
দলে দলে যায় পুরীর যাত্রী,
খোঁজ করে কেবা কার,
সেই সবাকার পিছু প'ড়ে থাকে
চলিতে পারে না আর।
রথ-যাত্রার যবে শুধু আর
দুই দিন বাকী আছে,
বহু কষ্টে সে পঁহুছিল সাঁজে
আসি কটকের কাছে।

"কোথা যাবি বুড়ি ? পথিক জনেক,
সুধাল সেখানে তারে ;
বৃদ্ধা বলিল, "চলিয়াছি বাবা,
চাঁদমুখ দেখিবারে" ।
ঈষৎ হাসিয়া পথিক বলিল,
"কেমনে পারিবি বুড়ী,
রাত পোহালে যে কাল রথ ক্ষেপি ;
দেখিবি কেমন করি" ?
শুনি চণ্ডালী রুষিয়া বলিল,
"বাকি যে এখনো পথ,
কি বলিছ তুমি রাতি পোহাইলে
কেমনে হইবে রথ" ।
হাসিয়া পথিক বলিল, "তাই ত,
চল তাড়াতাড়ি চল ।
তুই ক্ষেপী যদি না যাইবি সেথা
রথ কে টানিবে বল" ?
ঘুমাইল বুড়ী, রজনী-প্রভাতে
উঠে বলে চল যাই,
দুটী পা তাহার বেদনা-জড়িত,
উঠিতে শকতি নাই ।
বিষম বেদনা পারে না নড়িতে,
তবু দিয়া হামাগুড়ি,

রথেতে দেখিবে শ্রীমুখ বলিয়া
চলিতে লাগিল বুড়ী ।
ভক্তেরা সব জুটেছে শ্রীধামে,
রথযাত্রা যে আজি,
কাঙালের হরি উঠেছেন রথে,
অভিনব-বেশে সাজি ।
একি অঘটন, একি হ'ল আজ
চলে না দেবের রথ,
অযুত ভক্ত টানিছে রশি,
কর্দ্দম-হীন পথ ।
জুড়িল হস্তী, তবু যে গো রথ
তেমনি রহিল থির ;
ভাবনা-আকুল, প্রধান পাণ্ডা,
ঝরে নয়নের নীর ।
ধূলার মাঝারে লুটায়ে পাণ্ডা,
জানিতে পারিল ধ্যানে,
প্রবল ভক্ত কে এক রথের
পশ্চাৎ দিকে টানে ।
যাবৎ না ছোঁয় সমুখের 'রশি'
পূত করতল তার,
হাজার হস্তী, রথের চক্র
নড়াতে নারিবে আর ।

বাহির হইল পাণ্ডার দল
ভক্ত অন্বেষণে,
কৌপীন-পরা সন্ন্যাসী আনে
বৈষ্ণব সাধু জনে।
তিলক-ভূষিত নামাবলীধারী
ব্রাহ্মণ আনে ধ'রে ;
কাহারো পরশে সে বিরাট রথ
এক তিল নাহি নড়ে।
খুঁজিতে খুঁজিতে কত দূর আসি
প্রধান পাণ্ডা হায়,
দেখিল খঞ্জ বৃদ্ধা জনেক
পুরী-অভিমুখে যায়।
হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছে বুড়ি,
পাণ্ডা সুধা'ল তারে,
"প্রখর-রৌদ্রে ভিক্ষার লাগি
যাইবি কাহার দ্বারে" ?
তপ্ত বালুতে পুড়িতেছে পদ,
আঁখি ভ'রে গেছে জলে,
দিনু এই সিকি ফিরে গিয়ে ব'স,
এই অশথের তলে।
বুড়ি বলে, "বাবা বল কবে রথ,
পয়সাতে কাজ নাই।

রথেতে দেখিব শ্রীমুখ বলিয়া
রোদে চলিয়াছি তাই"।
শুনিয়া ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে,
বৃদ্ধারে বুকে করি,
'পেয়েছি' 'পেয়েছি' বলিয়া ছুটিল,
পুরীর সড়ক ধরি।
ফাঁফর বৃদ্ধা বলে, "দাও ছাড়ি,
বাবা গো চাঁড়ালি মুই",
ব্রাহ্মণ বলে, "দে মা পদধূলি,
গুরুর গুরু যে তুই"।
চকিতে দেখিল, যাত্রীরা সবে,
জয় জয় জয় র'লে,
প্রধান পাণ্ডা আসিল রে সেই,
খোঁড়া বুড়ী ল'য়ে কোলে।
অচল সে রথ চলিতে লাগিল,
বুড়ী যবে দিল হাত,
উল্লাসে সবে গাহিয়া উঠিল
ধন্য ধন্য জগন্নাথ!
সাশ্রু-নয়নে অযুত-কণ্ঠে,
গাহিল অযুত প্রাণ,
সত্যই তুমি কাঙালের হরি,
ভক্তের ভগবান।

প্রশ্ন

১। এই কবিতার সার মর্ম্ম বল। ২। কবিতাটি মুখস্থ বল।

অকাল সন্ধ্যা

বর্ণনীয় বিষয়ঃ—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অকাল তিরোধানে শোকোচ্ছ্বাস।

। খোল মা দুয়ার খোলো, প্রভাতেই সন্ধ্যা হোলো,
দুপুরেই ডুব্‌ল দিবাকর গো।



সমরে শয়ান ওই সুত তোর বিশ্বজয়ী
কাঁদনের উঠ্‌ছে তুফান ঝড় গো॥ }

2 সবারে বিলায়ে সুধা   সে নিল মৃত্যু-ক্ষুধা
কুসুম ফেলে সে নিল খঞ্জর গো ।
তাহারই অস্থি চিরে   দেবতা বজ্র গড়ে
নাশে ঐ অসুর অসুন্দর গো ।
ঐ মা যায় সে হেসে,   দেবতার উপরে সে,
ধরা নয়—স্বর্গ তাহার ঘর গো ॥
3 যাও বীর যাও গো চ'লে   চরণে মবণ দ'লে
করুক প্রণাম বিশ্ব চরাচর গো ।
তোমার ঐ চিত্ত জ্বেলে,   ভাঙ্গালে ঘুম. ভাঙ্গালে,
নিজে হায়, নিব্‌লে চিতার প'র গো ।
বেদনার শ্মশান-দহে,   পুড়ালে আপন দেহে
হেথা কি নাচ্‌বে না শঙ্কর গো ॥

প্রশ্ন

কবিতাটিব ব্যাখ্যা কব ।

প্রহরী

বর্ণনীয় বিষয় :—পাঠান সম্রাট মহাত্মা নাসিরুদ্দীনের পাঠপ্রীতি, মিতব্যয়িতা ও মহারাণীর সহিত কথোপকথনচ্ছলে প্রজারঞ্জন রীতি বর্ণন।

চারিদিকে গ্রন্থরাশি পাঠের আগার মাঝে
বসিয়া নাসিরুদ্দীন জ্ঞানের সাধক সাজে।
কি আনন্দে মগ্ন যোগী! কঠোর সে সাধনায়
স্বরগের সুধা-ধারা হৃদি-মাঝে ব'হে যায়;
আননে উঠিছে ফুটি পবিত্র উজ্জ্বল হাসি।
কোরাণ নকল রত; চারিদিকে গ্রন্থরাশি।
সহসা চাহিয়া ফিরি কঙ্কণের ঝনৎকারে
দেখেন পাঠান-রাজ বেগম দাঁড়ায়ে দূরে।
ফুল্ল-পারিজাত সম হাসি হাসি মুখখানি,
কে যেন দিয়াছে তায় বিষাদ-কালিমা টানি।
পড়িতেছে গণ্ড বাহি, দর-বিগলিত ধারা
নত মুখে মহারাণী কাঁদিছেন আত্মহারা।
নামাইয়া সন্তর্পণে ক্রোড় হ'তে বহিখানি
চলিলা সম্রাট যেথা দাঁড়াইয়া মহারাণী।
আদরে মুছায়ে অশ্রু অতীব কোমল স্বরে
বলিলেন, "প্রিয়তমে, কি হ'য়েছে বল মোরে।
স্বামীর আদরে অশ্রু আরো দ্রুত ধারে বয়,
ভাবাবেশে মহারাণী নিশ্চল নির্ব্বাক রয়।

বহুক্ষণে অশ্রু মুছি বলিতে লাগিল ধীরে,
জাঁহাপনা, শেষ বাঁদী ছিল যে আমার তরে,
তোমার আদেশে আজি বিদায় দিয়েছি তায় ;
সেঁকিতে ছিলাম রুটী, দেখ, হাত জ্বলে যায়।
পুড়িয়া গিয়াছে রুটী, কাঁদিতে ছিলাম তাই,
তোমার আহার তবে ঘরে আব কিছু নাই।
বিশাল এ ভারতেব সম্রাট আমাব স্বামী,
একটি বাঁদীও কিগো পেতে নাহি পাবি আমি ?
পুড়েছে আমার হাত, তুমি ববে অনাহারে,
অগণিত ধন-রত্ন রাজকোষে কার তরে ?

থামিলেন মহাবাণি, সম্রাট বলিলা ধীবে,
কাঁদিতেছ, মহারাণি, শুধু তুমি এরি তরে ?
হাত পুড়িয়াছে তব, মোব হাত আছে ঠিক,
এর জন্যে এত কাঁদা ! ছি ছি মহারাণি, ধিক্ !
তুমি যদি নাহি পার করিবারে গৃহ কাজ,
নিজ হস্তে লব তাহা, আমিই করিব আজ।
আমি ভেবেছিনু বুঝি অঙ্গ, বঙ্গ, উড়িষ্যায়,
দারুণ দুর্ভিক্ষ ক্লেশে বহুলোক মারা যায়,
তারি জন্যে বুঝি তুমি কাঁদিতেছ গৃহকোণে,
প্রজাদের শোক বুঝি বিষম বেজেছে প্রাণে।
প্রিয়তমে, এই দুঃখে এ ভাবে কাঁদিতে আছে ?
ভাব দেখি তোমা চেয়ে কত দুঃখী দেশ মাঝে।

সদা নিদারুণ দুঃখে করিতেছে হাহাকার,
তুমি কাঁদিতেছ ভাবি এক বেলা অনাহার ?
অগণিত ধন-রত্ন রাজার ভাণ্ডারে আছে ;
আমার ভাণ্ডার নয়, তার প্যানে চাওয়া মিছে।
আমি ত প্রহরী মাত্র, নাহি মোর অধিকার
সে ধনের কণামাত্র করিবারে ব্যবহার।
প্রত্যহ কোরাণ লিখি করি যাহা উপার্জ্জন,
তাহাতেই দু'জনার চলে গ্রাস আচ্ছাদন।
পর ধনে লোভ করা, সে কি ভাল মহারাণি ?
তোমার সে ভাব নয়, আমি তাহা ভাল জানি
নিরুৎসাহ না হইও, মনে রেখো দিনমান
মাথার উপরে থাকি দেখিছেন ভগবান।

প্রশ্ন

কবিতাটির সার মর্ম্ম লিখ।

ধাত্রীপান্না

বর্ণনীয় বিষয় ঃ—ধাত্রীপান্নার নিজ পুত্র বলি দিয়া প্রভুপুত্র মেবাররাজ উদয়সিংহকে রক্ষা করেন।

কুলপাংশুলার গর্ভে জনম যাহার
সেই দাসী-পুত্র হবে মিবারের রাজা ?
খদ্যোতে হরিয়া লবে দ্যুতি চন্দ্রমার ?
মৃগেন্দ্র-বিক্রমে বনে বিচরিবে অজা ?
অসুরে অমৃত-ভাণ্ড করিবে হরণ ?
কুকুরে যজ্ঞের হবি করিবে লেহন ?

না দিব ঘটিতে হেন, বাঁচাব কুমারে;
হিন্দুর গৌরব-রবি, রাণাবংশধর
রহিবে অক্ষত দেহে, বলুক আমারে
অপত্যঘাতিনী লোকে, তাহে নাহি ডর।
দাতাকর্ণ লভে পুণ্য বধি বৃষকেতু
আমার অপত্যবধ হবে ধর্ম্মহেতু।

কেনরে অজস্র অশ্রু হৃদিবজ্রসারে
পড়িস্ বহিয়া, পান্না পাশরিবে স্নেহ।
'অশ্বত্থামা হত' এই মিথ্যা সমাচারে
কুরুক্ষেত্র রণে দ্রোণ ত্যজিলেন দেহ;
মহারথ তিনি, তবু বাৎসল্যের দাস!
নারী হ'য়ে বীরধর্ম্ম করিব প্রকাশ।

স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্রে দীক্ষা যার আছে,
কঠোর বীরের ধর্ম্ম পালে সেই জনে,
আত্ম-পরিজন-স্নেহ তুচ্ছ তার কাছে,
স্থির লক্ষ্য একমাত্র সঙ্কল্প সাধনে।
ভীরুতা মমতা, দুয়ে নিকট সম্বন্ধ,
কাপুরুষ ক্ষুদ্র-চেতা সদা স্বার্থে অন্ধ!

এস পুত্র! পরাইব রত্ন আভরণ,
সাজাব তোমারে স্বর্ণ-খচিত সুবেশে,
পালঙ্কের অঙ্কে তোমা করিয়া স্থাপন,
কাঁপাব চামরবাতে কাকপক্ষ কেশে।
নির্জল নিশ্চল নেত্রে চা'ব মুখপানে,
যাবৎ না হও ছিন্ন ঘাতক-কৃপাণে

পালাও উদয়সিংহ, সিংহের শাবক,
শৃগালের বৃত্তি এবে আশ্রয় তোমার;
জ্বলিবে যখন তব পৌরুষ-পাবক,
উৎপাত-পতঙ্গ পুড়ে হবে ছারখার।
ঢাকুক প্রভাত-রবি কুহেলী-তিমির,
অচিরে প্রদীপ্ত তেজে উঠিবে মিহির!

প্রশ্ন

১। ধাত্রীপান্নার কথা কি জান বল ও তাহার অদ্ভুত কার্য্যের বর্ণনা কর।

২। নিম্নলিখিত পদগুলির অর্থ বল—মৃগেন্দ্রবিক্রমে বনে বিচরিবে অজা; আমার অপত্যবধ হবে ধর্ম্মহেতু; নারী হয়ে বীরধর্ম্ম করিব প্রকাশ।

শিক্ষা

বর্ণনীয় বিষয় ঃ—ভারতীয় আর্য্যগণের জীবনের মূলনীতি আদর্শ।

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছো তুমি
ত্যজিতে মুকুট-দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি,
ধরিতে দরিদ্র বেশ ; শিখায়েছো বীরে
ধর্ম্ম-যুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহারিতে।
কর্ম্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্ব্বফল-স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্ম-বন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছো তুমি সংযমের সাথে,
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছো উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্য-কর্ম্মে করেছো মঙ্গল,
শিখায়েছো স্বার্থত্যজি' সর্ব্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

প্রশ্ন

১। এই কবিতাটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা কর।

২। কোন্ কোন্ মহাপুরুষের জীবনে এই নীতি ও আদর্শগুলি বিশেষরূপে পূর্ণতালাভ করিয়াছিল বলিতে পার কি ?

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত

বর্ণনীয় বিষয় ঃ—বরিশালের অদ্বিতীয়, কর্ম্মবীর অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের বন্দনা।

জনমিলে প্রাণখানি প্রেমে পূর্ণ করি'—
সাধিতে সকল কর্ম্ম সে চরণ স্মরি'।



শিখাইছ সরলতা সকলেরে ডাকি'—
সত্যের অক্ষয়-মূর্ত্তি হৃদয়েতে রাখি'।
পাপের কালিমা মাখা এ পঙ্কিল দেশে
পুণ্যালোকে উদ্ভাসিছ সকলের মন।

কে জানে গো স্বপ্নসম কোথা হ'তে এসে'
আলোকিয়া মাতৃভূমি করিবে গমন।
যাহারা তোমারে হায় চিনিল না আজো
তাহাদের প্রতি তুমি নহ তো বিমুখ,—
সবারে বাসিয়া ভাল আনন্দে বিরাজ
তুচ্ছ করি' হীন হিংসা, ঘৃণ্য স্বার্থ-সুখ।
সংসারে থাকিয়া তুমি নহ আত্মহারা,
পবিত্র উজ্জ্বল ওগো গগনের তারা।

প্রশ্ন

কবিতাটির ব্যাখ্যা কর।

নবীন-বঙ্গ

বর্ণনীয় বিষয়ঃ—নবীন বাঙ্গলার সুসন্তানগণের কীর্ত্তিকাহিনী।

রচিল ধর্ম্ম-ত্রিবেণী-তীর্থ তব ভগবান পরমহংস,
শ্রুতির বার্ত্তা শুনাইল পুনঃ তব রায়, সেন, ঠাকুর বংশ।
বাড়বোজ্জ্বল করুণা-সাগর ভরিল অঙ্ক রত্নপুঞ্জে,
বঙ্কিম নব শুভ-সংসার রচিল তোমার মাধবী-কুঞ্জে।
লুটি মাগো তব চরণ ধূলায় তুমি যে আমার জননী-বঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান ললিত-কলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

দত্ত মিত্র গুপ্ত বসুর অর্ঘ্যে পদার-বিন্দে দীপ্তি,
গিরিশ নবীন হেম মধু করে সুধাদানে জ্ঞান-ক্ষুধার তৃপ্তি,

মতি সুরেন্দ্র মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষিত করে অযুত শিষ্যে
ব্রতী ব্রজেন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যা বর্ত্তিকালোক বিতরে বিশ্বে।
লুটি মাগো তব চরণ ধূলায় তুমি যে আমার জননী-বঙ্গ
জ্ঞান-বিজ্ঞান ললিত-কলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

জ্ঞানী দানবীর রাসবিহারীর কণ্ঠে ধ্বনিত ন্যায়ের বিশ্ব,
স্বর্ণ তারক মহশীন মণি বলির ধর্ম্মে হ'য়েছে নিঃস্ব।
রাজনীতি রণক্ষেত্রে ধ্বনিল রথী শ্রীকৃষ্ণ দাসের শঙ্খ,
শোভে আশুতোষ মৈত্র ত্রিবেদী অলিসম তব কমল-অঙ্ক।
লুটি মাগো তব চরণ ধূলায় তুমি যে আমার জননী-বঙ্গ
জ্ঞান-বিজ্ঞান ললিত-কলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

ঋষি মহেন্দ্র গঙ্গাধরের ভৃঙ্গার জলে বাঁচিল সৃষ্টি,
হোতা প্রফুল্ল নব রসায়ন হোমানলে করে হবির বৃষ্টি।
বহে গুরুদাস অগুরু-পাত্র, অবনীর করে প্রাচীন ছত্র,
যোগী জগদীশ তাড়িতাক্ষরে লিখিল তোমার বিজয়-পত্র।
লুটি মাগো তব চরণ ধূলায় তুমি যে আমার জননী-বঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান ললিত-কলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

তব অপত্য দূর ভূখণ্ডে লভিল শৌর্য্য সৈনাপত্যে,
তোমার চিত্ত জিনিয়া বিত্তে চিনিল নিত্যে,—চরম সত্যে।
দুহিতারা তব জাগ্রত করে রমণী-গরিমা তিমির-লুপ্ত,
সেন সরকার শাস্ত্রী তোমার করে প্রবুদ্ধ কীর্ত্তি সুপ্ত।
লুটি মাগো তব চরণ ধূলায় তুমি যে আমার জননী-বঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান ললিত-কলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

সত্ত্ব-বজের মিলন-মন্ত্র ঘোষিল বিশ্বে বিবেকানন্দ,
দিগ্‌জয়ী কবি সিন্ধুব কূলে গাহিল সাম্য সাবেব ছন্দ।
শবচ্চন্দ্র-মবীচি-মালায় কল্প-সুষমা তোমাব অঙ্গে,
তব বন্দনা কূজে আনন্দে কাব্য-কুঞ্জে কোটী বিহঙ্গে।
লুটি মাগো তব চবণ-ধূলায় তুমি যে আমাব জননী-বঙ্গ,
জ্ঞান-বিজ্ঞান ললিত-কলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

ধেয়ান-স্তব্ধ যোগ-নিরুদ্ধ মুদিত তোমাব হৃদববিন্দ,
কোটী ভক্তেব দুর্জ্জয় তপে তোমাব আননে দ্যুতি অনিন্দ্য।
পুত্র তোমাব আর্ত্তেব তবে ববিছে শীর্ষে অশনি-বর্ষ,
দেশেব কর্ম্মে সেবাব ধর্ম্মে যাদেব আত্মত্যাগেব হর্ষ।
লুটি মাগো তব চবণ-ধূলায় তুমি যে আমাব জননী-বঙ্গ,
জ্ঞান বিজ্ঞান ললিত-কলায় শোভিত অমল শ্যামল অঙ্গ।

প্রশ্ন

১। এই জাতীয় সঙ্গীতটী গান কব।

২। এই কবিতাব বন্দিত প্রত্যেক ব্যক্তিব নাম ও তাঁহাব কীর্ত্তি বাশিব সংক্ষেপে উল্লেখ কব।

অন্নদার বরদান

বর্ণনীয় বিষয় ঃ—ভক্ত ভবানন্দ গৃহে আনন্দময়ী অন্নপূর্ণার শুভাগমন-কালে ভাগীরথী উত্তরণ বর্ণন।

অন্নপূর্ণা উত্তরিল ভাগীরথী-তীরে,
পার কর বলিয়া ডাকিল পাটনীরে।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী,
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি'।
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী,
একা দেখি কুলবধূ, কে বট আপনি।
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার,
ভয় করি, কি জানি কে দিবে ফের ফার।
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী,
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি।
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি,
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত,
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত।

পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম,
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম।
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন।
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ,
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে,
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই,
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই।
পাটনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল,
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল।
শীঘ্র আসি' নায়ে চড় দিবা কিবা বল,
দেবী ক'ন, দিব আগে পারে ল'য়ে চল।
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ,
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ!
পাটনী বলিছে মা গো, বৈস ভাল হয়ে,
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে।
ভবানী কহেন, তোর নায়ে ভরা জল,
আল্‌তা ধুইবে, পদ কোথা থোব বল।
পাটনী বলিছে মা গো, শুন নিবেদন,
সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ।

পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে,
রাখিলা দু'খানি পদ সেঁউতি উপরে।
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে,
সেঁউতি হইল সোণা, দেখিতে দেখিতে!
সোণার সেঁউতি দেখি' পাটনীর ভয়,
এ মেয়ে ত মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।
তীরে উত্তরিল তরী, তারা উত্তরিলা,
পূর্ব্ব মুখে সুখে গজগমনে চলিলা।
সেঁউতি লইয়া হাতে, চলিলা পাটনী,
পিছে দেখি তারে, দেবী ফিরিলা আপনি।
সভয়ে পাটনী কহে চক্ষে বহে জল,
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল।
হের যেই সেঁউতিতে থুয়েছিলে পদ,
কাঠের সেঁউতি মোর হইল অষ্টাপদ।
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়,
দয়ায় দিয়াছ দেখা, দেহ পরিচয়।
তপ-জপ নাহি জানি, ধ্যান জ্ঞান আর,
তবে যে দিয়াছ দেখা, দয়া সে তোমার।
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া,
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া!
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে,
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্লা অষ্টমীতে।

ভবানন্দ মজুন্দার-নিবাসে রহিব,
বর মাগ, মনোনীত যাহা চাহ দিব।
প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড় হাতে,
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।
'তথাস্তু' বলিয়া দেবী দিলা বর দান,
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান
বর পেয়ে পাটনী ফিরিয়া ঘাটে যায়,
পুনর্ব্বার ফিরে চাহে দেখিতে না পায়।

প্রশ্ন

১। অন্নপূর্ণার আত্ম পরিচয় দান নিজ ভাষায় বর্ণনা কর।

২। সেবকার, বাম, সিদ্ধিতে, কুকথায়, পঞ্চমুখ, পাষাণ বাপ, কোকনদ, সেউতি অষ্টাপদ,—এই শব্দগুলির অর্থ বল।



প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বর্ণনীয় বিষয় ঃ—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের বন্দনা।

প্রশান্ত অন্তরে বসি, হে ঋষি প্রবর,
অফুরন্ত ক্লান্তিহীন উদ্যত উদ্যমে



কি ফুল্ল জ্ঞানের পুষ্প বিকাশি' সুন্দর
সে ফুলে অমৃতপান করিছ সংযমে।

ভোগসুখ তুচ্ছ করি নিত্য চিত্ত ভরি
অক্ষয় অমূল্য নিধি করিছ সঞ্চয়।
সে রত্ন যতনে তুলি' দিলে উপহবি ;
ধন্য তাহে জন্মভূমি। তুমি বিশ্বময়
ঘোষিলে দেশের খ্যাতি, আলোকি' কিবণে
অতীত বিস্মৃত তাব গৌরব অমল।
ক্ষুদ্র এই স্তুতি-পুষ্প লবে কি চরণে ?
এ নহে সুবভি-স্নাত প্রফুল্ল কমল।
কৃপা করি উপহার লইলে, বহিব
অসীম আনন্দ প্রাণে, চরণে নমিব।

প্রশ্ন

কবিতাটিব ব্যাখ্যা কব।

মেঘনাদ

বর্ণনীয় বিষয়ঃ—রাম-রাবণ যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ বধ পর্ব্বে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞাগারে বিভীষণ ও ইন্দ্রজিতের কথোপকথন।

চাহিলা দুয়ার পানে অভিমানে মানী,
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শূল হস্তে ধূমকেতু সম
খুল্লতাত বিভীষণে বিভীষণ রণে—
"এতক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে,—
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায় তাত, উচিত কি তব
এ কাজ? নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ শূলী শম্ভূনিভ
কুম্ভকর্ণ; ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী;
নিজ গৃহ-পথ, তাত, দেখাও তস্করে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"

উত্তরিলা বিভীষণ,—"বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘব-দাস আমি; কি প্রকারে
তাহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি :—
"হে পিতৃব্য' তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা তাত, কহ তা দাসেরে!"

মহামন্ত্র বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিনবদন লাজে উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে;—
"নহি দোষী আমি বৎস। বৃথা ভৎর্স মোরে
তুমি! নিজ কর্ম্ম-দোষে, হায়! মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি!
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী, প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কাল সলিলে!
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি! পরদোষে কে চাহে মজিতে?"

কহিলা বীরেন্দ্র বলী;—"ধর্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি; কোন্ ধর্ম্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,

জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব—জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে—গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ—পর, পর সদা !
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে ?"

প্রশ্ন

১। ধূমকেতু, অরিন্দম, বাসববিজয়ী, রাবণি, বিরত, উপরোক্ত শব্দগুলির অর্থ বল ও পদ পরিচয় দাও।

২। এই কথোপকথন হইতে কি শিক্ষা লাভ করিলে ?



পৃথিবী ও স্বদেশ

বর্ণনীয় বিষয় ঃ—পৃথিবী ও স্বদেশের সহিত মানবের সম্বন্ধ কি, তাহা বর্ণনচ্ছলে স্বদেশের হিতসাধনে উপদেশ।

জান না কি নর তুমি, জননী জনমভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে ?
ভূমেতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পূরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী জঠর পরিহরি॥
যার বলে বলিতেছ, যা'র বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।
যা'র বলে তুমি বলী, তা'র বলে আমি বলি
ভক্তিভাবে কর তা'রে স্নেহ॥
তোমার প্রসূতি যেই, তাঁহার প্রসূতি এই,
বসুমতী মাতা সবাকার।
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি তোমার জননী ক্ষিতি
জনকের জননী তোমার॥

প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।
বিশেষতঃ নিজ দেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধ জীব যার স্নেহমদে ॥
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার ॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের নির্গুণে ধরি
বিদেশের গুণীরে ফেলিয়া ॥
স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব-তুলি ধ্যান ধরে, চিত্তপটে চিত্র করে,
স্বদেশের সকল ব্যাপার ॥
থাকি স্বদেশের হিতে, চল সত্য ধর্ম্ম পথে,
সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পূরাও তাঁহার আশা,
দেশে কর বিদ্যা বিতরণ ॥

প্রশ্ন

কবিতাটীর ব্যাখ্যা কর।

সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জের ভারতে আগমনোপলক্ষে

বর্ণনীয় বিষয় ঃ—সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ভারতে আগমন

প্রবল বাড়ব বহ্নির মত বারিধি বক্ষ হ'তে
উঠিয়া যে জাতি চলিল রঙ্গে আবার আলোক-স্রোতে.
মথিয়া জলধি দলিয়া মেদিনী লঙ্ঘি' শৈলরাজি,
সে জাতির রাজা মহারাজ ঐ ভারতে এসেছে আজি।
বাজুক্ দামামা, উঠুক নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি,
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি

যে জাতি গ্রীসের করিল মুক্ত দৃঢ় বন্ধন-পাশ,
করিল বিধান রবে না মানুষ মানুষের ক্রীতদাস,
প্রচারিয়া স্বাধীনতার তন্ত্র বিপুল বিশ্ব মাঝ
সে জাতির রাজা মহারাজ ঐ ভারতে এসেছে আজ।
বাজুক্ দামামা, উঠুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি,
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি।

নিউটন্ যার বাঁধিল সূত্রে জগৎ জগৎসনে,
ডারুইন্ যার বাঁধিল নিয়মে জগতের জীবগণে,
সেক্সপীয়র যার বাঁধিল ছন্দে হৃদয়রত্ন খনি,—
এসেছে প্রথম আজি এ ভারতে সে জাতির নৃপমণি।
বাজুক্ দামামা, উঠুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি,
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি।

মানিয়া লইল শাসন যার অনার্য্য আর্য্যসুত,
স্থাপিল ভারতে গভীর শান্তি সাম্য-মন্ত্রপুত,
মুক্ত করিল স্বাধীন ধর্ম্ম স্বাধীন চিন্তাস্রোতে,—
সে জাতির রাজা এসেছে ভারতে সুদূর বৃটন্ হ'তে।
বাজুক্ দামামা, উঠুক্ নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি,
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি।

কোথায় বৃটন্—কোথায় ভারত, ভিন্ন আকাশ যার,
এখানে যখন আলোক, তখন সেখানে অন্ধকার ;
মধ্যে গভীর গরজে জলধি, লঙ্ঘি সে পারাবারে
এসেছে ভূপতি—লহ মা ভারত বরণ করিয়া তারে।
বাজুক দামামা, উঠুক নিশান বিবিধ বর্ণে সাজি,
ভারতের রাজা, ভারতের রাণী ভারতে এসেছে আজি।

প্রশ্ন

কবিতাটির ব্যাখ্যা কর।

সুরেন্দ্র-প্রয়াণে

বর্ণনীয় বিষয়ঃ—ভারত গৌরব কর্ম্মবীর, স্বদেশ-প্রেমিক, অদ্বিতীয় বাগ্মী, কূটরাজনীতি বিশারদ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোক গমনে শোকোচ্ছ্বাস।

সে কি পুণ্য দিন! যবে বিধাতার গূঢ় অভিপ্রায়
সহসা করিল ছিন্ন কেশরীর স্বেচ্ছার বন্ধন,
নব মহাভারতের সংগঠন পরিকল্পনায়
তেজোদৃপ্ত মুক্ত চিত্তে জাগাইল বিরাট স্পন্দন।
পঞ্জাব সীমান্ত হ'তে চট্টলার চারু-শ্যাম তীর
যুগান্তের সুপ্তি-ভঙ্গে সে কম্পনে উঠিল নড়িয়া,
বজ্র-কণ্ঠ-উদগীরিত অগ্নি-মন্ত্রে, হে বাগ্মী, হে বীর,
চেতায়ে দেশাত্মবোধ এক জাতি তুলিলে গড়িয়া।
উৎসাহের জ্বলদর্চ্চিঃ চিরদীপ্ত তোমার অন্তরে,
ঝটিকা-ঝাপটে কভু ক্ষণতরে হয়নি নির্ব্বাণ—
সদ্যোমৃত প্রাণ-পুত্রে বিসর্জ্জিয়া চিতার উপরে
ছুটিয়া গিয়াছ যেথা কর্ত্তব্যের—দেশের আহ্বান!
দীর্ণ-বক্ষ বাঙ্গালার দুঃখ-দিগ্ধ দারুণ দুর্দ্দিনে,
অশনি-সম্পাত সহি' অবিচল হিমাদ্রির মত,
'স্বদেশীর' সাম-রবে মিলাইলে নবীনে-প্রবীণে,
যোড়াইলে খণ্ড বঙ্গ জনশক্তি করিয়া জাগ্রত।

ব্যর্থতাব মনস্তাপে, যত্ন পুষ্ট আশার বিনাশে
টলে নাই কোনো দিন, হে স্থিরধী, তব ভার-কেন্দ্র,
প্রভুত্বেব রোবদৃষ্টি, নিযতির ক্রুব পরিহাসে
সম নির্ব্বিকার তুমি, আত্মজয়ী হে শূর সুরেন্দ্র।
কাবাগাব মন্ত্রিসভা, হাতে-গড়া জাতি-প্রতিষ্ঠান
কি ববণ, কি বর্জ্জন, শুধু দেশহিত সাধিবাবে ;
বিবেক নির্দ্দিষ্ট পথে দ্বিধাহীন সদা আগুয়ান
প্রশংসা কি লোক নিন্দা লক্ষভ্রষ্ট কবেনি তোমাবে।
সফল সঙ্কল্প তব, সিদ্ধ আজি সাধনা তোমার—
লভিয়া তোমার দীক্ষা সঙ্ঘবদ্ধ সম্বুদ্ধ ভারত ;
শত বরষের জাড্য, ক্ষুদ্র স্বার্থ করি' পরিহার
সমুৎসুখ রচিবাবে সম্মিলিত রাষ্ট্র-পরিষৎ।
অন্তিম শয়নে কর্ম্মী কর্ম্ম অন্তে শান্তিতে শয়ান,
অস্তমিত চিরতরে বাঙ্গালার গৌরবের রবি !
শোকমগ্ন দেশবাসী নিরখিয়া এ মহাপ্রয়াণ—
উদ্দেশে প্রণমে দেব ! দূর হ'তে দেশান্তের কবি।

প্রশ্ন

কবিতাটিব সার মর্ম্ম লিখ।

গুরুদাস-প্রয়াণে

র্ণনীয় বিষয় :—বঙ্গবিশ্রুত ৺ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

হে বঙ্গের গুরু প্রয়াণে তোমার
গৃহে গৃহে, দেব ! উঠে হাহাকার !



মরমের ব্যথা কণ্ঠ পথে ছুটি
অশ্রুধারে ঝরে, ভারে আপনার ॥

গুরুদাস-প্রয়াণে

এ শোক-আঁধার কাটিবে কেমনে
আছে আভা কিবা এ মেঘের পাছে ?
তোমার এ শোকে তুমিই সান্ত্বনা—
মৃত্যু মাঝে তব অমরত্ব আছে ॥
নহ শোচ্য তুমি হে বঙ্গ-গৌরব
হে সিদ্ধ-পুরুষ এ জীবন-ব্রতে ।
নহ শোচ্য তুমি কর্ম্ম-ধর্ম্ম-বীর !
বিকীর্ণ মহিমা যাঁহার ভারতে ॥
নহ শোচ্য তুমি পুত্রে পুণ্য যাঁর -
দীর্ঘায়ুঃ যাঁহার দীপ্ত যশোভাসে ।
নহ শোচ্য তুমি মর্ত্ত্য হ'তে যাঁরে
প্রেরিলা বিধাতা সপ্তর্ষি সকাশে ॥
নহ শোচ্য তুমি বরেণ্য ব্রাহ্মণ !
বঙ্গের বশিষ্ঠ ! গুরু ! গোত্রপতি !
অপগত শোক— দেব পুণ্যশ্লোক !
স্মরণে তোমার গুণের সংহতি ॥
হে বঙ্গের 'গুরু' গুরু তব কেবা
কার 'দাস' ছিলে তেজস্বী ব্রাহ্মণ ?
শাস্ত্র তব গুরু, কর্ত্তব্যের সেবা—
এ মন্ত্রে করেছ সার্থক জীবন ॥
ছিলে ত রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি—
একাধারে হেন মহিমা কোথায় ?

বঙ্গের বশিষ্ঠ ! গুরু ! গোত্রপতি !
বন্দ্য গুরু দাস ! প্রণতি তোমায় ॥
নব গুণযুত পরম কুলীন
সমাজের চির আদর্শ মহান্ ।
তব প্রদর্শিত কর্ম্ম-রাজপথে
চলে যেন সব বঙ্গের সন্তান ॥
তোমার চরিত— দিগ্-দরশন
জীবন-অর্ণবে হোক্ বাঙ্গালার ।
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মে অদ্বিতীয় যোগী !
রহ চিরপূজ্য ভারত মাঝার ॥
তোমার মহিমা নিত্য সূর্য্য সম
এ বঙ্গ-ভুবন করিবে উজ্জ্বল ।
তব স্মৃতি-জ্যোতিঃ ধ্রুবতারা প্রায়
বঙ্গহৃদাকাশে রবে অচঞ্চল ॥

প্রশ্ন

বঙ্গগৌরব, সিদ্ধপুরুষ, কর্ম্ম-ধর্ম্ম বীর, পুত্রে পুণ্য যাঁর, তেজস্বী ব্রাহ্মণ, বরেণ্য ব্রাহ্মণ, বঙ্গের বশিষ্ঠ, জ্ঞানভক্তি কর্ম্মে অদ্বিতীয় যোগী—এই সকল বিশেষণের ব্যাখ্যা কর ।

বিশ্বপতি

বর্ণনার বিষয়:—সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন।

লক্ষ লক্ষ সৌর জগৎ নীল গগন গর্ভে,
তীব্র বেশ, ভীম মূর্ত্তি, ভ্রমিছে মত্ত গর্ব্বে।
কোটি কোটি তীক্ষ্ণ উগ্র অনল-পিণ্ড-তারা
দৃপ্ত নাদে, ঝলকে ঝলকে উগারে অনল-ধারা।
এ বিশাল দৃশ্য, যাঁর প্রকটে শক্তি বিন্দু,
নমি সে সর্ব্বশক্তিমান চির-কারণ-সিন্ধু।

স্তূপীকৃত, গগন-সহিত ধূলি সিন্ধু-কূলে;
কোটি কীট করিছে বাস এক সূক্ষ্ম ধূলে!
কীট-দেহ-জনম-মৃত্যু, নিমিষে কোটি লক্ষ;
ভুঞ্জে দুঃখ, হরষ, রোষ, প্রীতি, ভীতি, সখ্য।
এই সূক্ষ্ম কৌশল রচে যাঁর জ্ঞান-বিন্দু
নমি সে চির-প্রমাদ-শূন্য চিৎ-স্বরূপ-সিন্ধু।

প্রশ্ন

ঈশ্বরকে 'বিশ্বপতি' বলিবার সার্থকতা এই কবিতার বর্ণনা হইতে দেখাও।